FOCUS

WHERE THE GENERATIONS CONVERGE

DEPARTMENT OF PHYSICS

City College

102/1 Raja Rammohan Sarani,

Kolkata-700 009

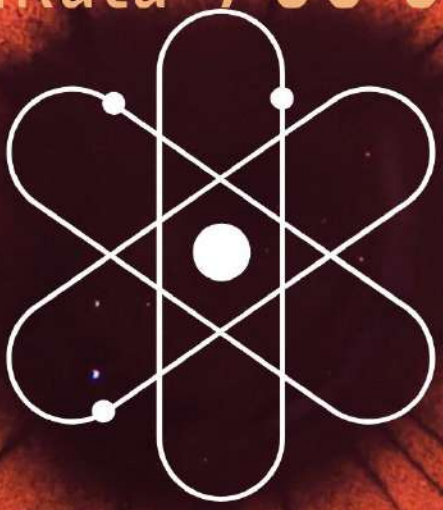

THE TRUE LABORATORY IS THE MIND, WHERE BEHIND ILLUSIONS WE UNCOVER THE LAWS OF TRUTH.

-Jagadish Chandra Bose

FOCUS

-Where the generations converge

2019

Department of Physics
City College

102/1 Raja Rammohan Sarani,
Kolkata – 700009

"The true laboratory is the mind,
where behind illusions we uncover the laws of truth."
- Jagadish Chandra Bose

প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৯

সংখ্যা : তৃতীয়

সম্পাদক : সমাপ্তি পাল,
অধ্যাপিকা

প্রচ্ছদ : শুভদীপ দে,
দ্বিতীয় বর্ষ

অক্ষরবিন্যাস : তিয়াসা চক্রবর্তী - তৃতীয় বর্ষ
অরিত্র গুপ্ত, শুভদীপ দে - দ্বিতীয় বর্ষ
শুভদীপ কাজলি – প্রথম বর্ষ

প্রকাশনা : পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
সিটি কলেজ,
১০২/১, রাজা রামমোহন সরণী,
কলকাতা – ৭০০০০৯

মুদ্রণ : ইনডোর আউটডোর ক্রিয়েটিভ এজেন্সি,
৯/১এ চিন্তামণি দাস লেন,
কলকাতা – ৭০০০০৯

মতামত জানান এই ঠিকানায়: spal_city@yahoo.in

CITY COLLEGE

Affiliated to the University of Calcutta
102/1, Raja Rammohan Sarani, Kolkata - 700009
Phone : 033 2350 1565, Office : 033 2360 7463
E-mail : principal.citycollege@gmail.com
Website : www.citycollegekolkata.org
GST No. : 19CALC00619D1DE

ESTD. 1881

শুভেচ্ছাবার্তা

সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত বাৎসরিক পত্রিকা "FOCUS - Where the generations converge"-এর এটি তৃতীয় প্রকাশ, সেই উপলক্ষে প্রথমেই বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান সকল ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সিটি কলেজের একতলায় প্রায় ছ'শ বর্গমিটার জায়গার উপর অবস্থিত ছটি সুসমৃদ্ধ পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগার এবং একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার পরীক্ষাগার নিয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিভাগ। ১৯৩৯ সালে এই বিভাগ পাশ কোর্স নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনার্স কোর্স শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। শুরু থেকে বহু সুনামধন্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই বিভাগে অধ্যাপনা করে গেছেন। প্রফেসর জে.এন্.সেন, ডঃ এম্.এম্.ঘোষ, প্রফেসর সি.আর.দাশগুপ্ত এবং ডঃ পি.কে.সেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকমহলে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন এক অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। সত্তর-আশি দশকের উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে পদার্থবিদ্যার বাংলায় লেখা বই বলতে সি.আর.ডি.জি.-র বইকেই বোঝাতো। সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও সি.আর.ডি.জি. দুটি নাম যেন ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই বিভাগ থেকে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে স্বদেশে ও বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ছয় জন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক, একজন জি.এল্.আই. ও তিন জন অতিথি অধ্যাপকরা বিভাগের হাল শক্ত হাতে ধরে পদার্থবিদ্যা বিভাগের পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। বর্তমান সমাজের গতির সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মিলিত প্রয়াসে এই পত্রিকা প্রকাশনার আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই। আশা করি বছর বছর আরও সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হোক এই পত্রিকা। সকলের কাছে আমার শুভেচ্ছা রইল।

Sital prasad Chattopadhyay

(ডঃ শীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, কলিকাতা- ৯

Principal
City College, Kolkata-9

From the HOD's Desk

This is the third issue of our annual magazine from the Department of Physics, City College. This magazine has contributions from different forays of the academia. The different literary exhibits, is a testament to the diaspora present in our thought process. For some it might be too naïve, which is very scarce nowadays in our lives, but for those who want to take a look back at the formative years would enjoy reading it. My students and my fellow colleagues have worked hard to make this possible. Although I had not anticipated that this issue would have my message since I was going to retire this February, I feel blessed to have got three more years to guide my beloved students. I wish them all the success in life and for the reader I would ask not to judge the literature but to enjoy the thought behind.

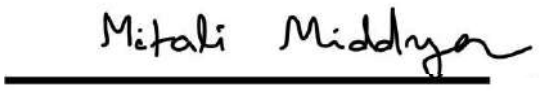

Dr. Mitali Middya,
Head of the Department,
Department of Physics,
City College,
Kolkata 700009

নিবেদন

বিভিন্ন স্বাদের একগুচ্ছ সুন্দর সুন্দর রচনায় সেজে উঠেছে আমাদের বিভাগের পত্রিকা "FOCUS- Where the generations converge"-এর তৃতীয় সংখ্যা। ছাত্রছাত্রীরা তাদের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছে এই পত্রিকাকে। কবিতা, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, বিজ্ঞানের কথা সবই আছে, আর আছে কিছু ভালো ছবির সম্ভার। পত্রিকার সুন্দর প্রচ্ছদটি রূপ পেয়েছে আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শুভদীপ দে'র পরিকল্পনায়। বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপকদের মূল্যবান রচনা পত্রিকায় এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। ধীরে ধীরে FOCUS হয়ে উঠছে বিভাগের নবীন থেকে প্রবীণ সকলের মুক্ত অভিমত প্রকাশের আঙিনা। তাই, সংগৃহীত সমস্ত রচনাকে কোনো রকম পরিমার্জন ছাড়াই পত্রিকার পাতায় তুলে ধরলাম- ভালোমন্দ বা গ্রহণযোগ্যতা সবটুকু বিচারের ভার রইল পাঠকের হাতে। তাদের মূল্যবান বিচার বিশ্লেষণ পত্রিকাকে আরও উন্নত করবে। পাঠকের মতামতকে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

সবশেষে বলি, এবছর থেকে আমাদের শিক্ষাব্যাবস্থায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সেমেস্টার পদ্ধতিতে পঠনপাঠন চালু হওয়ায় প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সংখ্যা বেড়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য পুরনো পদ্ধতিতেই আছে। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশে সকলের উৎসাহ একই রকম। পড়াশোনার ফাঁকে পত্রিকার কাজের জন্য সময় তারা ঠিকই বের করেছে। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো যত্ন আর ধৈর্য্যসহকারে টাইপ করার কাজটি ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই করে থাকে, আর তাই হয়তো পত্রিকার জন্য তাদের অনেক ভালবাসা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে, মূলত যাদের আগ্রহে FOCUS-এর শুভারম্ভ হয়েছিল তারা আজ তৃতীয় বর্ষে। ক'দিন বাদেই কলেজের পাঠ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। সময়ের নিয়মে নতুন ছাত্রছাত্রীরা কলেজে আসবে। কিন্তু আশা করব বিভাগের প্রাক্তনী হিসেবে তারা তাদের এই উৎসাহ আর ভালবাসাকে পরবর্তীকালের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চালিত করে FOCUS-কে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

– সমাপ্তি পাল, সম্পাদক

সূচীপত্র

1. শুভেচ্ছাবার্তা i
2. From the HOD's Desk ii
3. নিবেদন iii
4. জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ডায়েরি (দীপ্তাংশু বিশ্বাস) 1
5. নির্বাক বন্ধু (সুস্মিতা সরকার) 2
6. Pencil sketch (Shatabdi Debnath) 3
7. Painting (Archishman Sarkar) 4
8. কুমায়ূনযাত্রীর ডায়েরী (সৌম্য চ্যাটার্জি) 5
9. সিটি কলেজ (অরিত্র গুপ্ত) 14
10. COMPUTER as the BEAUTY and the BEAST (Durlov Dutta) 17
11. অভিমান (শুভদীপ কাজলি) 19
12. ডায়েরির পাতা (শুভদীপ দে) 19
13. সান্ধ্য আড্ডা (সায়ক ঘোষ) 20
14. Painting (Sourav Banik) 23
15. Photograph (Sourav Das) 24
16. তাই বলে কি প্রেম দেবো না ? (সৌম্য মুখার্জী) 25
17. বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞান, অন্ধকার থেকে আলো (সুজয় কুমার মণ্ডল) 30
18. শব্দ-জব্দ 32
19. বিমল (তরুণ কুমার তপাদার) 34
20. Estimation: A Precursor to Measurement (Bhupati Chakrabarti) 36
21. Dirac’s monopole: (Amiya Bhushan Biswas) 38
22. Photograph (Kaustav Maitra) 43
23. Photograph (Sanchali Saha) 43
24. Photograph (Shuvadeep Dey) 44
25. জন্মান্তর (অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী) 45
26. ধর্মজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান (অমিতাভ পাল) 52
27. Reunion '18 (Photographs) 59
28. Picnic '19 (Photoghaphs) 60
29. Department of Physics 61

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ডায়েরি

– দীপ্তাংশু বিশ্বাস, তৃতীয় বর্ষ

আকাশ জুড়ে আজ মহাজাগতিক স্বয়ম্বর,
নক্ষত্রপুঞ্জ হতে ছায়াপথ হেঁটে হাতছানি দেবে ব্রহ্মান্ডের মহারথীগণ।
সকাল সাতটা, শীতের এই মন্থর ভোরে
ফটোমিটারে কেবল ওয়ার্ম-আপ সারছে অলসতম উষ্ণ সূর্যালোক।
উদ্দীপ্ত ক্ষুদ্রতরঙ্গরশ্মি অভিমুখে রাখা ফটোগ্রাফিক ফিল্মে
ধরা পড়ছে সূর্যের উপর শুক্রের পরিচলন।।
দুর্লভতর বিস্ময় দীর্ঘস্থায়ী না হলেও
অনন্ত শোভাযাত্রার উদ্বোধনে ট্রানজিট অফ ভেনাস সম্পূর্ণ সার্থক।।

দুপুর বারোটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট, মেঘমুক্ত পরিবেশও
ধীরে ধীরে ভরে ওঠে সন্ধ্যার দৃশ্যমান অমাবস্যায়।
কোরোনাগ্রাফের স্থির পর্দায় তখন শুধুই
সূর্যের ছটামন্ডলে অবিরাম ঘটে চলা বেরঙিন নিঃশব্দ বিপ্লব।
ক্ষণিকের চিত্রপটে ডানা মেলেও, দিবাকাশে ভাসমান
হীরের আঙটির দ্যুতি রয়ে যায় শাশ্বত হিরণ্ময়।।
দূরবীণে রাখা চোখে শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ,
প্রকৃতির মাঝে আপাত বাসায় ফেরা পাখিদের কলরব।।

গোধূলি পেরিয়েছে মুহূর্ত পূর্বে,
দিগন্ত হতে আলোর প্রতিফলিত রেখা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে।
উত্তর আকাশে মিথুন রাশি থেকে দক্ষিণে লুব্ধক নক্ষত্র পর্যন্ত ছড়িয়ে
নীলাভ সবুজ এক মায়াবী গালিচা।
সন্ধ্যা ছ'টা বেজে পঞ্চাশ মিনিট,
রূপকথার আলোকবর্ষ সেজে ওঠে হ্যালির ধূমকেতুর রাজকীয় ছদ্মবেশে।।
দানবিক কৃষ্ণগহ্বর আজ পরাজিত সুপারনোভার অতল বিস্ফোরণে,
পুণর্জন্মে উল্লসিত কালান্তক তারাদের ইচ্ছা।।

রাত এগারোটা, মাঝ গগন চিরে যুদ্ধবিলাসী সিকান্দারের বর্শা রূপে
ধেয়ে আসে আতসবাজিসম উল্কাপাত।
পরিযায়ী জেমিনিড গ্রহাণুর শুষ্ক বৃষ্টিধারা,
গভীর এই নিঃস্তরঙ্গ রজনীতে আনে অকাল দীপাবলী।

রাত প্রায় পৌনে দুই, চন্দ্রকলায় লাগা আধিভৌতিক অন্ধকারে
শৈত্যের দুর্ধর্ষ অশরীরী কার্যত উৎখাত।।
সাতাশ গুণ গতি বাড়িয়ে নীল উপগ্রহ জেনেছে
গ্রহণের ছায়ায় ঢেকে থাকা রক্তাভ লাল পরিণতির নিয়মাবলী।।

দীর্ঘ অষ্টপ্রহর অতিবাহিত...
ক্লান্ত ডায়েরি কিংবা অবসন্ন কলম এখন শায়িত চিরায়ত বিজ্ঞানের পৃষ্ঠায়।
পৃথিবীর অন্য প্রান্তে হয়ত কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেগে ওঠে
রূপকথায় মোড়া আরেকটি ভোরের অপেক্ষায়।।
অবৈজ্ঞানিক কিংবা কল্পবিজ্ঞান নয়,
যে মহাকাশের অন্দরে লুকিয়ে থাকে দিশেহারা অসংখ্য বহুবর্ণী রহস্য।
ইনফিনিটির ছন্দে লেখা কোনো ডায়েরি তবে কিভাবে
উন্মোচন ঘটাবে প্রকৃত বিজ্ঞানের অপরিমিত উৎস!!

নির্বাক বন্ধু

– সুস্মিতা সরকার, প্রথম বর্ষ

দুপুর রোদে পথিক তুমি,
শীতল ছায়ায় এসো।
পক্ষীসকল আষাঢ় রাতে,
আমার শাখে বসো।
আমি দিই কত প্রাণীর
মুখেতে আহার;
আমায় কেটে তোমরা বানাও,
নিজের বাড়িঘর।
রোগীর মুখে পথ্য দিয়ে,
আমিই বাঁচাই প্রাণ;
পাইনা আমি এর বদলে,
কোনো প্রতিদান।
তাই আমি বারে বারে,
গাছ হয়ে ভুমির পরে,
জন্ম নেব বাঁচাতে,
তোমাদেরই প্রাণ।।

– Shatabdi Debnath, 2nd Year

– Archishman Sarkar, 1st year

কুমায়ূনযাত্রীর ডায়েরী

– সৌম্য চ্যাটার্জি*, প্রাক্তন ছাত্র

২৪শে নভেম্বর, সকাল ১০টা: বহুদিন পরে আজ একটা অন্যরকম সকাল। রোজকার কাজের একঘেয়েমি নেই, নেই কাজ শেষ করার ব্যস্ততাও। তাই সব মিলিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজে, কাঠগোদাম ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে লিখতে শুরু করলাম এবারের বেড়ানোর ডায়েরী। কাঠগোদামকে হিমালয়ের কুমায়ূন অঞ্চলের প্রবেশদ্বার বলা চলে। তাই আমাদের কুমায়ূন যাত্রার শুভ মহরৎ এই কাঠগোদাম থেকেই। অনেকের মতই কুমায়ূনের সঙ্গে আমারও পরিচয় কৈশোরে, জিম করবেটের বিখ্যাত শিকার সংকলন "ম্যানইটারস অফ কুমাওন" এর হাত ধরে। করবেটের শিকার জীবনের প্রায় তিরিশ বছরের পটভূমি উত্তরাখন্ডের এই অংশটি প্রচলিত মতে কুর্মাবতাররূপী বিষ্ণুর বাসস্থান হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় এর ভালো নাম কুর্মাঞ্চল বা চলতি ভাষায় কুমায়ূন। এহেন স্বর্গীয় জায়গায় আসার আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্য একেবারেই ধার্মিক নয়। প্রবাদে বলে "climb the mountain so you can see the world, not so the world can see you"। প্রায় বারো হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত মুন্সিয়ারির খুল্যিয়া টপ থেকে বিখ্যাত পঞ্চচুল্লি রেঞ্জকে সামনাসামনি দেখতে পাওয়ার দুর্লভ সুযোগের সন্ধানেই আমাদের কুমায়ূনে আসা। মুন্সিয়ারির দূরত্ব কাঠগোদাম থেকে প্রায় তিনশো কিমি, তাই একদিনে সোজাসুজি মুন্সিয়ারি যাবার চেষ্টা না করে আমরা পুরো রাস্তাটা তিনটে ভাগে পাড়ি দেব। প্রথম দিনে আমাদের গন্তব্য বিনসার ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারী। বিনসারের দূরত্ব এখান থেকে একশো কিমির কাছাকাছি আর রাস্তার অবস্থাও ভালো, তাই মাঝপথে ভীমতাল আর আলমোড়াতে থামলেও ঘণ্টা চারেকের বেশী সময় লাগার কথা নয়। একটা ভালো ব্যাপার যে, আমাদের বাহনটি একেবারেই নতুন এবং ড্রাইভার জে.পি জিও (পুরো নাম জয়প্রকাশ) অত্যন্ত অভিজ্ঞ, কাজেই পুরো ট্যুরে গাড়ি সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হবে বলে মনে হয় না। এর কৃতিত্ব অবশ্যই আমার সহযাত্রী অর্ণবের। সকালে সবার আগে উঠে, ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে রীতিমতো দরদাম করে একটা কাজের কাজ ও করেছে।

আমাদের চার বন্ধুর এই দিন আষ্টেকের প্ল্যানটা খানিকটা হঠাৎ করেই ঠিক হয় মাস দু'য়েক আগে। সাধারণত এত দূরের এবং লম্বা ট্যুরের প্ল্যানে বেশ অনেকটা আগে থেকেই ট্রেনের টিকিট আর হোটেলের ব্যবস্থা করা উচিৎ। কিন্তু কুর্মাবতারের আশীর্বাদেই হোক বা আমাদের ইচ্ছাশক্তির জোরেই হোক যাতায়াত এবং থাকার ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ অসুবিধেয় আমাদের পড়তে হয়নি। বাকি ছিল গাড়ির বুকিং। সেটাও বেশ সুলভেই হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। যেসব জায়গাকে ছুঁয়ে আমাদের এবারের রুট ভাবা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যেটুকু তথ্য দেবার সেটা যথাস্থানেই বলবো এখন কেবল রুটটার একটা বর্ণনা দিই। কাঠগোদাম থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য মুন্সিয়ারি এবং আজ আমরা যাচ্ছি বিনসার পর্যন্ত, এটা তো আগেই বলেছি। রাত কাটিয়ে কাল সেখান থেকে বাগেশ্বর হয়ে আমরা পৌঁছব চৌকরী আর তারপর পরশু দিন বিরথি ফলস দেখে যাব মুন্সিয়ারিতে। মুন্সিয়ারি থেকেই খুল্যিয়া টপের ট্রেকিং সেরে পরের দিন শুরু হবে ফেরার পালা। বিনসার, চৌকরী, মুন্সিয়ারি প্রতিটি জায়গাই তাদের সৌন্দর্য্যে স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেকটির স্বাদ পেতে যাতে সময় এবং ক্লান্তি অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় সেটা মাথায় রেখেই রুটটা ভেবেছি আমরা। সবকটা জায়গাতেই থাকার জন্য বাছা হয়েছে কুমায়ূনমণ্ডল বিকাশ নিগমের

(KMVN) ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসগুলোকে, কারণ সত্যি বলতে একটু খরচাসাপেক্ষ হলেও অবস্থানের প্রেক্ষিতে এগুলোই সেরা। এবার এসব পরিকল্পনা কতটা সফল হয় সেটা সময়ই বলবে।

আজ আমরা নয়াদিল্লি থেকে ট্রেনে যখন কাঠগোদাম এসে পৌঁছলাম তখন প্রায় ভোররাত আর তেমনই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। সৌভাগ্যবশত কাঠগোদাম ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসের দূরত্ব স্টেশন থেকে বেশী নয়, নাহলে ওরকম পরিস্থিতিতে রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছনো সত্যিই কষ্টকর হতো। ঘুম একটু কম হয়েছে ঠিকই তবে সকালে উঠেই হিমালয়ের দেখা পেয়ে শরীর আর মন দুটোই চাঙ্গা হয়ে গেছে সকলের। এবার রওনা দেব বিনসারের উদ্দেশ্যে। বাকি লেখালিখি বিনসার পৌঁছে।

২৫শে নভেম্বর, সকাল ৯টা: চারিদিক ঘন জঙ্গলে ঢাকা KMVN বিনসারের টেরেসে বসে ডায়েরী লিখছি। ঝান্ডী ধর পাহাড়ের ওপর, প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই রেস্ট হাউসটি অবস্থানের বিচারে এক কথায় অনবদ্য। আশির দশকে বিনসার স্যাংচুয়ারীর আখ্যা পায় মূলত স্থানীয় ওক গাছের সংরক্ষণের জন্য এবং তার পর থেকেই এখানে মানুষের গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ এসেছে। কিন্তু তার অনেক আগে, একাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই বিনসারই ছিল কুমায়ূনের চান্দ রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এখন এই প্রায় পঞ্চাশ বর্গ কিমি আয়তনের স্যাংচুয়ারী হিমালয়ের নিজস্ব কয়েকশো প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল। আর আছে হিমালয়ের নামকরা সব সুউচ্চ শৃঙ্গের উপস্থিতি। মূল রেস্ট হাউস থেকে খানিকটা সামনে, খাদের ধারে এই টেরেসটায় দাঁড়ালে সামনে যতদূর চোখ যায় কেবল হিমালয়ের শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আমার একদম বাঁদিকে, জঙ্গলের ওপর উঁকি দিচ্ছে এক চিলতে নন্দাঘুণ্টি, তারপর ক্রমশ ডানদিকে একে একে ত্রিশূল, মৃগথুনি, মাইকতোলি, নন্দাদেবী, পানওয়ালি দ্বার, নন্দাখাত, নন্দাকোট, দাংথাল, রাজরাম্ভা এবং শেষে পঞ্চচুল্লির পাঁচটি শৃঙ্গের সমাহারের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্যতম কল্পনাপ্রবণতা থাকলেই সময়ের জ্ঞান রাখা অসম্ভব।

কাল কাঠগোদাম থেকে রওনা হয়ে একবার ভীমতালে, আরেকবার লাঞ্চের জন্য আলমোড়াতে থামা ছাড়া মোটামুটি টানা গাড়ি চালিয়েও আমাদের KMVN বিনসারে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সূর্যাস্তের সময় হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার অবস্থা খুব ভালো হলেও আলমোড়ার পর থেকে চড়াই বেশ বেশী আর এমনিতেই ঘন ঘন বাঁক থাকায় পাহাড়ি রাস্তায় গতির হিসেব সমতলে বসে কষা সম্ভব নয়। যাই হোক, গাড়ি থেকে নেমে জিনিসপত্র কোনরকমে ঘরে রেখে আমরা প্রায় হুড়মুড় করে গিয়ে যখন টেরেসে হাজির হলাম ততক্ষণে ত্রিশূলের চূড়ায় সোনালি ছোপ লেগেছে। তারপর উচ্চতার ক্রম মেনে একে একে রঙিন হয়ে উঠল বাকি শৃঙ্গগুলো। বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর সম্বিৎ ফিরতে তড়িঘড়ি ছবি তুলতে গিয়ে দেখি শুরুর সেই সোনালি রঙ ততক্ষণে প্রায় কমলা হয়ে এসেছে। ছবি তোলার পর্ব শেষ করতে করতেই সূর্যদেব সেদিনের মতন অস্ত গেলেন আর তার পরই ঝপ করে ঠাণ্ডাটা যেন বেশ খানিকটা বেড়ে গেল। এদিকে সূর্যাস্ত দেখার টানে, উত্তেজনার ঝোঁকে যখন তাড়াহুড়ো করে টেরেসে এসেছি, তখন খেয়াল করে ক্যামেরাটা আনলেও শীতের জামাকাপড় সবই ঘরে রয়ে গেছে। অগত্যা সেই যে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলাম সেটা কমলো বেশ অনেকক্ষণ পর, প্রায় ডিনারের সময়। তাই কাল রাতে আর ডায়েরী লেখার সুযোগ হয়নি।

বিনসারের রেস্ট হাউসটা স্যাংচুয়ারীর মধ্যে হওয়ায় এখানে পাকাপাকিভাবে ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবস্থা নেই। সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা দু'য়েক জেনারেটরের সৌজন্যে ইলেক্ট্রিসিটি থাকে, বাকি সময়টা মোমবাতির আলোই ভরসা। তাই ইলেক্ট্রিসিটি থাকাকালীন ডিনার সেরে নেওয়াই রীতি। সেই মতন সাতটা নাগাদ ডাইনিং হলে পৌঁছে সত্যি বলতে বেশ অবাকই হলাম খাবারের আয়োজন দেখে। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এরকম একটা জায়গায়, ঘন জঙ্গলের মাঝে এত রকম সুস্বাদু পদের আশা আমরা কেউই করিনি। তাই আমাদের ডিনারের পরিমাণ দেখে এখানকার অন্য বাসিন্দারা অবাক হয়েছিল কিনা সেটা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। যাই হোক, খাওয়ার পর আরও একবার টেরেসে গিয়ে হাজির হলাম। বলা বাহুল্য, এবার আর ভুল হয়নি শীতের জামাকাপড় পরার কথা, কিন্তু তা সত্ত্বেও রীতিমতো কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল বিনসারের ঠাণ্ডা হাওয়া। টেরেসে থাকাকালীনই বার দু'য়েক জ্বলানেভা করে সেদিনের মত রেস্ট হাউসের ইলেক্ট্রিসিটি বন্ধ হল আর তারপর বুঝতে পারলাম ইলেক্ট্রিসিটি না থাকার মজাটা।

এমনিতেই পাহাড়ি এলাকার আকাশ অনেক বেশী পরিষ্কার হয় সমতলের তুলনায়, উপরন্তু অমাবস্যার সময় হওয়াতে প্রচুর তারা সন্ধ্যে থেকেই ঝিকমিক করছিল। আলো নেভার পর যেন সংখ্যাটা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। চেনা তারামণ্ডলগুলো খোঁজার ফাঁকে মনে পড়ছিল ছোটবেলাতে বাবার সঙ্গে ছাদে উঠে তারা চেনার দিনগুলো। শহর থেকে একটু দূরে আমাদের বাড়ি হওয়ায় মোটামুটি সারাবছরই তারায় ভরা আকাশ আমাদের সঙ্গী ছিল। কত গ্রীষ্মের রাত গভীর হয়েছে কালপুরুষ খুঁজে, কত শীতের সকাল শুরু করেছি শুকতারার সঙ্গে সেগুলো গুনে শেষ করা যায় না। এখন মফস্বলেও থাবা বসিয়েছে উন্নয়ন আর দূষণ। সোডিয়াম, মার্কারি ভেপারের আলোয় রাতের আকাশ যেমন তার কালিমা হারিয়েছে তেমন আমরা হারিয়েছি প্রকৃতির এই পাঠশালাকে। এসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম সন্দেহ নেই কারণ ইতিমধ্যে টেরেসে রেস্ট হাউসের বাকি বাসিন্দারাও যে এসে ভিড় করেছেন সেটা বুঝতে পারিনি। যাই হোক, আরও খানিকক্ষণ ওখানে কাটিয়ে দশটা নাগাদ ঘরে এসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই, ঘুম ভাঙল সকাল ছ'টায়, মোবাইলের অ্যালার্মে। ট্যুরের প্রথম সূর্যোদয়, কেউই মিস করতে চায় না। তাই ঠাণ্ডা আটকানোর সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করে অন্ধকার থাকতে আমরা চারজন ফের হাজির হলাম টেরেসে। প্রায় আধঘণ্টা পরে সূর্যদেব উঁকি দিলেন আমাদের ডান দিকের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে। আর তার সঙ্গে শুরু হল পাহাড়ের চূড়ায় রঙের উল্টো খেলা। প্রথমে লাল, তারপর কমলা আর শেষে সোনালি রঙের মুকুট পরা হিমালয় ধরা দিল আমাদের লেন্সে। যদিও প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব ক্যানভাসে, নিজস্ব শৈলীতে করা সেই শৈল্পিক সূক্ষ্মতাকে হুবহু বন্দি করার ক্ষমতা কোনও ক্যামেরার নেই, যেমন আমার নেই চোখে দেখার সেই অপূর্ব অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করার দক্ষতা। টেরেসে বসে চা পর্ব শেষ করে আমরা হাঁটা লাগালাম জিরো পয়েন্টের দিকে। রেস্ট হাউস থেকে জিরো পয়েন্টের দূরত্ব তিন কিমি মতন আর পুরো পথটাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। জিরো পয়েন্টের বিশেষত্ব হচ্ছে সেখান থেকে ত্রিশূলসহ কুমায়ূনী শৃঙ্গগুলো তো বটেই, চৌখাম্বা, কেদারনাথসহ কয়েকটি গাড়োয়াল হিমালয়ের শৃঙ্গও দেখতে পাওয়া যায়। শৃঙ্গ দেখা ছাড়াও জিরো পয়েন্ট গিয়ে আমাদের বাড়তি লাভ হল একজোড়া বার্কিং ডিয়ার আর বেশ কিছু নতুন পাখি দেখতে পাওয়া। ফিরে এসে জমিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে এবার আমরা রওনা দেব বাগেশ্বর হয়ে চৌকরির দিকে। দূরত্ব আগের দিনের মতই তাই আশা করি সময়ও একই রকম লাগবে।

প্যানোরমিক বিনসার, সূর্যোদয়ের সময় তোলা ছবি

রাত ৮টা: চৌকরিতে আজ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর সঙ্গে একটা হাল্কা হাওয়া বওয়ায় শীতের কনকনে ভাবটা আরও বেড়েছে। তাই রাতে উষ্ণতা হিমাঙ্ক অতিক্রম করলে অবাক হব না। সাড়ে ছ'হাজার ফুটের কাছাকাছি উচ্চতায় অবস্থিত এই চৌকরি গ্রাম হিসেবে আয়তনে ভীষণই ছোট। সাকুল্যে আড়াইশোটি পরিবারের বাস এখানে, তাই জনসংখ্যাও মেরেকেটে হাজার জন। আর সেই কারণেই প্রকৃতির সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কুমায়ূন হিমালয়ের বিখ্যাত কস্তূরী হরিণের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এদের সক্রিয় ভূমিকাই বোধহয় এর সবথেকে বড় উদাহরণ। চোরাশিকার প্রতিরোধ থেকে সরকারী ব্রিডিং ফার্মের রক্ষণাবেক্ষণ, সবেতেই এখানকার স্থানীয় মানুষরা সাহায্য করে বলেই দুষ্প্রাপ্য এই হরিণের সংখ্যা আগের থেকে কিছুটা হলেও বেড়েছে। জাতীয় সড়ক ধরে বিনসার থেকে আসার পথে এমনই একটা ফার্ম ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই বাঁদিকে পড়ে KMVN চৌকরির নাম লেখা একটা সাইনবোর্ড আর তার পাশেই রেস্ট হাউসের গেটটা। গেট থেকে মোরাম বিছোনো পথ ধরে, একটু ভেতরে ঢুকে, বাঁয়ে ঘুরেই একতলা, ঢালু টিনের ছাদওয়ালা মূল বাড়িটার প্রবেশদ্বার আর রিসেপশন। রিসেপশনের বাঁদিকে ডাইনিং আর কিচেন। আর ডানদিকে একটা খোলা বারান্দার গা ঘেঁসে পরপর তিনটে ঘর ট্যুরিস্টদের থাকার জন্য। ঘরগুলো খুবই বড়, সুন্দর করে সাজানো আর বড় বড় কাচের জানলা থাকায় সামনে বহুদূর অবধি দেখতে পাওয়া যায়। এই বাড়িটা ছাড়াও এখানে আরও ছ'টা কটেজে থাকার ব্যবস্থা আছে। কটেজগুলো একটা খোলা মাঠের ওধারে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো, তবে ভাড়া প্রায় দ্বিগুণ। মূল বাড়িটার সামনে একটা বেশ চওড়া খোলা উঠোনের বাঁদিকে একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ডান দিকে একটা ফুট কুড়ি উঁচু দোতলা ওয়াচ টাওয়ার আর সামনে তাকালে চোখে পড়ে বিনসারে দেখা সেই পর্বতশৃঙ্গগুলোকেই একটু অন্য কোণ থেকে কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে। যদিও একটা টিলা আর গাছপালার আড়ালে থাকায় রেস্ট হাউস থেকে নন্দাঘুণ্টি আর ত্রিশূলকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। তাই চারটে নাগাদ চেক ইন করে, লাঞ্চ সেরে আমরা চললাম পাশের ঐ টিলার দিকে। চৌকরি মূলত চা বাগানের জন্য পরিচিত। রেস্ট হাউসের প্রায় গা ঘেঁসে টিলার দিকে যাওয়া মাটির রাস্তাটা এই চা বাগানের মধ্যে দিয়েই। রাস্তা ধরে খানিকদূর গিয়ে একটা বাঁক নিতেই নন্দাঘুণ্টি আর ত্রিশূলসহ গোটা কুমায়ূন রেঞ্জটা যখন আবার আমাদের সামনে হাজির হল ততক্ষণে সূর্যাস্তের রঙ লাগতে শুরু

KMVN চৌকরি

করেছে তাদের চূড়ায়। তড়িঘড়ি রেস্ট হাউসে ফিরে ওয়াচ টাওয়ারে উঠে আরেকবার গতকালের মতই মুগ্ধ হলাম দিনের শেষ আলোয় হিমালয়কে দেখে। এ দৃশ্য বোধহয় চিরন্তন। তারপর বাকি সময়টা ঘরে বসে আড্ডা দিয়ে আর টিভি দেখে কাটিয়ে এবার পালা ঘুমোনোর। কাল সূর্যোদয় দেখে, ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়ব মুন্সিয়ারির পথে। বলা যায় আসল ট্যুর শুরু কাল থেকেই।

২৬শে নভেম্বর, সকাল ৮:৩০টা: মুন্সিয়ারির পথে রওনা হবার আগে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততার মধ্যেও ডায়েরী খুলে লিখতে বসতে হল একটা বিশেষ কারণে। সেটা বলবো, কিন্তু তার আগে চৌকরি থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্যের একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করি। আজও আমরা প্রায় অন্ধকার থাকতে উঠে প্রস্তুত হয়ে যখন ওয়াচটাওয়ারে গিয়ে উঠলাম তখন পুবের আকাশ সবে ফরসা হতে শুরু করেছে। আগেই বলেছি রেস্ট হাউসের অবস্থানের কারণে এখান থেকে ত্রিশূলকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই চৌকরিতে দিনের প্রথম স্পর্শ পেল নন্দাদেবী। তারপর একে একে রঙিন হল মৃগথুনি, মাইকতোলি, নন্দাকোট, পঞ্চচুল্লিসহ বাকি শৃঙ্গগুলো। এ দৃশ্য যতবার দেখি ততবারই মুগ্ধ হই আর সেটা শুধুই আমার আবেগের জন্য বলে আমার মনে হয় না। কাল লিখতে ভুলে গেছি, রেস্ট হাউস চত্বরে, ওয়াচ টাওয়ারের প্রায় গা ঘেঁসে একটা ফুলে ভরা পদম গাছ আছে যেখানে সারাদিনই প্রচুর পাখি আসে পদম ফুলের মধু খেতে। এই কাকভোরেও তাদের কিচিরমিচির আওয়াজ, যান্ত্রিক শব্দে অভ্যস্ত আমাদের শহুরে কানে আলাদাই একটা অনুভূতি এনে দিল। সূর্যোদয় দেখে উঠোনে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে সেই সব পাখিদের দেখছি এমন সময় সামনের মাঠের দিকে চোখ পড়ায় ঘাসের রঙ দেখে কেমন একটা সন্দেহ হল। নেমে এসে একটু ঝুঁকে দেখতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় স্বাভাবিকের থেকে বোধহয় একটু বেশীই চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম বাকিদের ডাকতে। অবশ্য তার কারণও ছিল। সূর্যের আলো যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানগুলো বাদ দিয়ে গোটা মাঠটাই তুষারে ঢাকা। ঘাসের ওপর হাত বোলালে একটা অদ্ভুত ভিজে ভিজে ভাবের সঙ্গে সাদা সাদা তুষারকুচি লেগে যায় গোটা হাতময়। আবার চোখের পলকেই সূর্যের উত্তাপে গলে তা হয়ে যায় জলবিন্দু। লেখা পড়ে এসব নিতান্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে গোটা ব্যাপারটাই এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে এখনও তার রেশ মন থেকে মোছেনি। যাই হোক, ব্রেকফাস্ট সেরে এবার মুন্সিয়ারির পথে পাড়ি দেবার সময় হয়েছে। চৌকরি থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্বও প্রায় একশো কিমি। মাঝপথে, মুন্সিয়ারি থেকে চল্লিশ কিমি মতন আগে আমরা একবার থামবো বিরথি ফলস দেখার জন্য। তাই চৌকরি থেকে একটু সময় হাতে নিয়ে না বেরোলে সূর্যাস্তের আগে মুন্সিয়ারি পৌঁছনো মুশকিল। সুতরাং আবার কলম ধরবো একেবারে মুন্সিয়ারি রেস্ট হাউসে পৌঁছে।

বিরথি ফলস

সন্ধ্যে ৭টা: অবশেষে মুন্সিয়ারি। স্থানীয় ভাষায় যার অর্থ 'বরফের জায়গা'। সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাড়ে সাতহাজার ফুট উচ্চতায়, অনেকগুলো হিমবাহ, গিরিপথ এবং পর্বতশৃঙ্গের ট্রেকিং বেস ক্যাম্প গৌরিগঙ্গা নদীর ধারের এই ছোট্ট জনপদটি এবং বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে পঞ্চচুল্লি অন্যতম। বস্তুত

মুন্সিয়ারিতে আসার পর দেখছি গত দুদিন ধরে দেখতে পাওয়া বাকি সমস্ত শৃঙ্গকে হারিয়ে পঞ্চচুল্লি প্রায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেছে আমাদের দৃষ্টিপথে। পূর্ব কুমায়ূন হিমালয়ের পরপর পাঁচটা সুউচ্চ শৃঙ্গকে একসঙ্গে পঞ্চচুল্লি বলা হয়। কথিত আছে যে, মহাভারতের পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে এই পাঁচটা পাহাড়কে উনুন হিসেবে ব্যবহার করে দ্রৌপদি শেষবারের মতন খাবার রান্না করেছিলেন, তাই নাম পঞ্চচুল্লি। মুন্সিয়ারি গ্রামের অবস্থান এই পঞ্চচুল্লির এতটাই কাছে যে গ্রামের প্রায় সব জায়গা থেকেই শৃঙ্গগুলো দেখতে পাওয়া যায়; এমনকি আমি এখন রেস্ট হাউসের যে ঘরে বসে ডায়েরী লিখছি তার জানলা দিয়ে তারাদের আবছা আলোতেও পঞ্চচুল্লির অবস্থান খুঁজে পেতে অসুবিধে হচ্ছে না। আজ বিরথি ফলস দেখে মুন্সিয়ারিতে পৌঁছতে আমাদের প্রত্যাশিত সময়ের থেকে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা রেস্ট হাউসে জিনিসপত্র রেখেই সোজা চলে গিয়েছিলাম গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে নন্দাদেবী মন্দিরে। দূরত্ব প্রায় তিন কিমি মতন। রাস্তা থেকেই শুরু হওয়া কয়েকধাপ সিঁড়ি উঠে খানিকটা হেঁটে গিয়ে পড়ে মন্দিরের গেট। ভেতরে ঢুকে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া একটা বেশ বড় সমতল মাঠের মতন জায়গার প্রায় মাঝখানে মন্দিরটা আর তার চারদিকে বাঁধানো চাতালের ওপর কয়েকটা বসার বেঞ্চ। মন্দির টপকে মাঠের প্রায় শেষের দিকে, খাদের ধারে দুটো ছোট ছোট ছাউনি আর তারপরই মন্দির চত্বরের সীমানা। ছাউনিতে গিয়ে দাঁড়ালে ঠিক সামনে দেখা যায় বিশাল পঞ্চচুল্লির শৃঙ্গগুলোকে আর কান পাতলে শোনা যায় খাদের নিচে থেকে গৌরিগঙ্গা নদীর কুলকুল শব্দ। আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম ততক্ষণে সূর্যাস্তের সময় হয়ে গেলেও গোটা রেঞ্জ জুড়ে মেঘ থাকায় বেলাশেষের পড়ন্ত আলোয় পঞ্চচুল্লিকে দেখার ইচ্ছেটা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। কাল আশা করা যায় আকাশ পরিষ্কার থাকবে, তাই দ্বিতীয়বার একটা চেষ্টা করবো আমরা খুল্যিয়া টপ থেকে ফিরে।

এবার আসি বিরথি ফলসের কথায়। আগেই বলেছি চৌকরি থেকে বিরথি প্রায় ষাট কিমি। মুন্সিয়ারি-থাল হাইওয়ে ধরে মুন্সিয়ারির দিকে যেতে যেতে অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে বিরথির জলধারা। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় প্রতিটি বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সেটার বিশালত্ব ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে তারপরই হঠাৎ একটা মোড় ঘুরেই চোখে পড়ে ঝর্ণার নাম লেখা ফলক আর তার গা ঘেঁসে ঝর্ণা পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়ি। প্রায় আধঘণ্টা সেই পাথরের ধাপ বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওঠার পর আমরা গিয়ে পৌঁছলাম প্রায় চারশো ফুট উঁচু ঝর্ণাটার একদম নীচে ছোট বড় পাথরে ভর্তি একটা খোলা সমতল জায়গায়। পাথরের ওপর ব্যাল্যান্স করে একদম খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে দূরে নীচে হাইওয়েটাকে দেখায় একটা সরু কালো ফিতের মতন। আর সামনে তাকালে চোখে পড়ে উল্টোদিকের পাহাড়, তার গায়ে খুদে খুদে ঘরবাড়ি আর চাষের জন্য ধাপ কাটা কাটা জমি। সাধারণত এ ধরণের পাহাড়ি ঝর্নাতে যে পরিমাণ ট্যুরিস্টের ভিড় থাকার আশঙ্কা আমরা করেছিলাম সেই তুলনায় বিরথি প্রায় ফাঁকাই। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন বেশ বেলা হলেও মাত্র হাতেগোনা কয়েকজনকেই দেখলাম ঝর্ণার আশেপাশে। আমরা থাকাকালীনই তারা বিদায়ও নিল। কাজেই আমরা একেবারেই নিজেদের মতন করে বিরথির সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সুযোগ পেলাম। মোটামুটি আধঘণ্টা মতন সময় কাটিয়ে, কাছেরই একটা দোকানে লাঞ্চ সেরে সোজা এসে পৌঁছেছি মুন্সিয়ারিতে।

এখানে সন্ধ্যে থেকেই ঠাণ্ডা পড়েছে জাঁকিয়ে। রাত বাড়লে সেটা যে আরও বেশ কয়েক ডিগ্রি নামবে সেটা বলাই বাহুল্য। ম্যানেজার ভদ্রলোকের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম গত কয়েকদিন ধরেই

পঞ্চচুল্লি শৃঙ্গ, মুন্সিয়ারি থেকে তোলা ছবি

উষ্ণতার পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ নিম্নমুখী। সেটা আমাদের ট্রেকিংএর ক্ষেত্রে খানিকটা হলেও চিন্তার বিষয়। যদিও খুল্যিয়া টপে বরফ পড়ার সময় হিসেবমতন এখনো হয়নি, কিন্তু উষ্ণতার এই অকালপতনে সেটা যদি শুরু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের কালকের ট্রেক অসম্পূর্ণ থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা। খুল্যিয়া টপের ট্রেকিং শুরু করার জায়গাটার নাম বলাতি বেন্ড। আজ যে রাস্তা দিয়ে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি সেই রাস্তায় মুন্সিয়ারি থেকে প্রায় আট কিমি মতন আগে বন দপ্তরের তৈরি খুল্যিয়া টপের নাম লেখা একটা গেট আর বিজ্ঞাপন আমরা আসার সময়ই দেখতে পেয়েছি। ওটাই বলাতি বেন্ড। সকালে জে.পি জিই আমাদের গাড়ি করে পৌঁছে দেবেন বলাতি বেন্ডে। তারপর উনিই হয়ে যাবেন আমাদের ট্রেকিং গাইড। খুল্যিয়া টপ ট্রেকিংএর দৈর্ঘ্য প্রায় আট-নয় কিমি কিন্তু যেহেতু উচ্চতার নিরিখে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট তাই মোটামুটি কাল গোটা দিনটাই আমাদের লেগে যাবে ট্রেক সম্পূর্ণ করে মুন্সিয়ারি ফিরে আসতে। তবে খুল্যিয়ার ট্রেকিং পূর্ণতা পায় যদি মাঝপথে ভুজানিতে ক্যাম্প করে রাত কাটিয়ে পরদিন বাকি তিন-চার কিমি হেঁটে টপে পৌঁছনো যায়। তাতে একটা দিন বাড়তি লাগে ঠিকই কিন্তু প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাক্ষী থাকতে পারার দুর্লভ স্মৃতিও জমা হয় অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। ভুজানির ক্যাম্প সাইটের কাছেই KMVN-এর একটা রেস্ট হাউসও তৈরি হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে। সেখানকার চা, জল ও সামান্য কিছু খাবার বাদ দিলে গোটা রাস্তায় খাবার এবং জলের আর কোনও ব্যবস্থা নেই, তাই আমরা মুন্সিয়ারি থেকেই প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল, কফি আর শুকনো কিছু খাবার প্যাক করে নেবার প্ল্যান করেছি। রেস্ট হাউসটা পুরোদমে চালু হলে অবশ্য এই সমস্যার খানিকটা সুরাহা হবে। কিন্তু তাতে ট্রেকিংএর মজাটা খানিকটা কমে যাবে বলে আমার মনে হয়। যাই হোক এবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। লেখা থামাই আজকের মতন।

২৭শে নভেম্বর, রাত ৯টা: রোদে পোড়া ত্বক, ক্লান্ত শরীর আর মনে খুল্যিয়া টপ ট্রেকিংএর সাফল্যের অনুভূতি নিয়ে লিখতে বসেছি আজকের অভিজ্ঞতা। সন্ধ্যে নাগাদ রেস্ট হাউসে ফিরে সকলেই এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে সামান্য কিছু খেয়ে, একটু ঘুমিয়েও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। কিন্তু স্মৃতি টাটকা থাকতে থাকতে লিখে ফেলার কাজটা সেরে ফেলাই শ্রেয়। আজ দিন শুরুই হয়েছিল একটা বেশ গা ছমছমে ঘটনা দিয়ে। ভোরবেলা ট্রেকিং-এর জন্য তৈরি হয়ে যখন রেস্ট হাউসের সামনের রাস্তাটায় গাড়ির অপেক্ষায় ঘোরাঘুরি করছি তখনও চারপাশ প্রায় অন্ধকারই বলা যায়। হঠাৎ হাত পনেরো সামনে একটা খচমচ শব্দ পেয়ে পাশের জঙ্গলের দিকে টর্চের আলো ফেলতে গাছগাছালির মধ্যে একটা ক্রমশ মিলিয়ে

যাওয়া লেপার্ডের শরীরের খানিকটা দেখতে পেলাম। যদিও চোখের পলকের মধ্যেই এই গোটা ব্যাপারটা ঘটল কিন্তু তাতেই বেশ বুঝতে পারলাম ভয়ে আর উত্তেজনায় আমার হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। সাধারণত দিনের এই সময়, লোকালয়ের এত কাছে লেপার্ড আসে না, আর আসলেও স্থানীয় কুকুরদের চীৎকারে তা টের পাওয়া যায়। তবে এখন যেহেতু ট্রেকিং সফল হয়েছে তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে লেপার্ডটা শুভ লক্ষণই ছিল।

এবার আসি ট্রেকিংএর কথায়। আজ আমরা যখন বলাতি বেন্ডে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সকাল সাড়ে ছ'টা। জে.পি জি আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করে, ইঞ্জিন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম অপার্থিব নির্জনতা বলতে যা বোঝায় এ অনেকটা সেরকম। নিস্তব্ধতা এতটাই বেশী যে নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। যাই হোক, সঙ্গের ফ্লাস্কে থাকা গরম কফিতে গলা ভিজিয়ে আমরা রওনা দিলাম খুল্যিয়া টপের উদ্দেশ্যে। পাথর বাঁধানো পথ সোজা উঠে গেছে শেষ পর্যন্ত খুল্যিয়া ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে, কাজেই রাস্তা খোঁজার পরিশ্রম এক্ষেত্রে নেই, তবে খুব বেশী যাতায়াত না থাকায় রাস্তার অবস্থা খুব ভালো নয়। খুল্যিয়া ফরেস্ট মূলত ওক আর রডোডেনড্রনের জঙ্গল। রডোডেনড্রনের গাছগুলো এখন ফুলহীন, তাই গোটা জঙ্গলটাই একঘেয়ে সবুজ। তবে এই জঙ্গলই এপ্রিল-মে মাসে রডোডেনড্রন ফোটার সময় সেজে ওঠে লাল রঙের বিভিন্ন বর্ণে। কিন্তু যার জন্য খুল্যিয়া ফরেস্ট সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল এখানকার ছত্রাক। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য, দামী এবং ওষধি গুণসম্পন্ন ছত্রাক এখানকার গাছে সারাবছরই জন্মায় যেগুলো এখানে প্রায় সংরক্ষিতভাবে বেড়ে ওঠে এবং পরে ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যদিও ছোটখাটো কিছু হরিণ আর ভাল্লুক ছাড়া এই জঙ্গলে বিশেষ জন্তুজানোয়ার তেমন থাকে না, তবে আজ জঙ্গলের আলোআঁধারি পথে চলার সময় কতবার যে গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরার আওয়াজে চমকে উঠেছি সকালের লেপার্ড দর্শনের কথা ভেবে তার ইয়ত্তা নেই। ঘন্টাখানেক চড়াই ওঠার পর খানিকটা অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় পৌঁছে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম রোদের লম্বা লম্বা রেখা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের ফেলে আসা পথে আলোছায়ার নতুন জ্যামিতি রচনা করেছে। ওখানে পাথরের ওপর বসেই খানিক জিরিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে, আরেকপ্রস্থ কফি খেয়ে আবার শুরু হল পথ চলা। পথ বলতে যা বোঝায় অনেক জায়গাতেই ব্যাপারটা তেমন নয়। কিছু কিছু জায়গায় তো রাস্তা এতটাই ভাঙাচোরা যে আমরা বাধ্য হলাম জঙ্গলের পথে শর্টকাট করতে। আরও বেশ খানিকটা চড়াই ওঠার পর জঙ্গল ক্রমশ পাতলা হয়ে এসে শুরু হল ঘাস জমির এলাকা। বুঝলাম আমরা ট্রি-লাইনের ওপরে উঠে এসেছি এই ঘণ্টা পাঁচেকের ট্রেকিংএ। গাছের আড়াল সরে যাওয়ায় এবার চারপাশের দৃশ্যপটও পরিষ্কার হল আমাদের সামনে। এতক্ষণ ধরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে পঞ্চচুল্লির দেখা পেলেও এবার গোটা রেঞ্জটার সৌন্দর্য্য দেখতে পেয়ে হেঁটে চলার নতুন উদ্যম ফিরে পেলাম আমরা সবাই।

প্রবেশদ্বার, খুল্যিয়া টপ

আরও আধ ঘণ্টা পর বেলা বারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম ভুজানির ক্যাম্প সাইটে, অসমাপ্ত KMVN রেস্ট হাউসের চত্বরে। এখানে রাতে থাকার সুযোগ থাকলেও অনেক আগে থেকে তার বুকিং না করলে মুশকিল। মূল বাড়িটার সামনে খানিকটা খোলা সমতল উঠোন মতন রয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে পঞ্চচুল্লির বিশালত্বে মুগ্ধ হতে বাধ্য হতে হয়। ট্রেকারদের ক্যাম্পিঙের ব্যবস্থাও এই উঠোনেই। তাই ওখানে বসেই লাঞ্চের পালা শেষ করে আবার শুরু হল আমাদের যাত্রা খুল্যিয়া টপের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে রেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার ভদ্রলোকের কাছ থেকে এটা শুনে আশ্বস্ত হয়েছি যে এখানে এখনও বরফ পড়া শুরু হয়নি। ভুজানি থেকে খুল্যিয়া টপ প্রায় তিন কিমি মতন অথচ উচ্চতার পার্থক্য প্রায় দু'হাজার ফুট। তাই রেস্ট হাউসকে পিছনে ফেলে একটু এগোতেই চড়াই বাড়তে শুরু করল আর তার সঙ্গেই অল্প হলেও শুরু হল উচ্চতাজনিত শ্বাসকষ্ট। বারে বারে থেমে, দম নিয়ে আরও ঘণ্টা দুয়েক ট্রেকিংএর পর অবশেষে খুল্যিয়া টপের প্রায় সমতল খোলা প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলাম আমরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার মতন অবস্থায় তখন কেউই আমরা ছিলাম না। সেটার উপলব্ধি এল মিনিট পনেরো জিরোনোর পর। হলদেটে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর শেষ হয়েছে খাদের কিনারায় গিয়ে আর তার ঠিক যেন গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বাঁয়ে নন্দাদেবী, রাজরাম্ভা আর প্রায় গোটা সামনের দিকটা জুড়ে আমাদের পরিচিত পঞ্চচুল্লি। তবে এখন তাদের উপস্থিতি অনেক বেশী ব্যাক্তিত্বময়, অনেক বেশী সুন্দর। নাম যদিও খুল্যিয়া টপ, কিন্তু দেখলাম এই প্রান্তর ছাড়িয়ে রাস্তা উঠে গেছে আরও ওপরের দিকে। আমাদের হাতে আর অতটা সময় ছিল না, তাই আমরা নামতে শুরু করলাম আগের রাস্তা ধরে। নামার সময় স্বাভাবিকভাবেই আর অতটা সময় লাগেনি তাই আমরা সন্ধ্যে সাতটা নাগাদই ফিরে এসেছি মুন্সিয়ারি রেস্ট হাউসে। এরপরের কথা তো আগেই লিখেছি। ইতিমধ্যে ডিনারের ডাক পড়েছে, সকলের শরীর আরো বিশ্রামও চাইছে।

২৮শে নভেম্বর, সকাল ১০টা: আজ ফেরার দিন। চেক আউটের পাট চুকিয়ে আমরা এখন রেস্ট হাউসের লবিতে অপেক্ষা করছি আমাদের গাড়ির জন্য। জে.পি জির গাড়িটি নতুন হওয়ায় যতই ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন তাঁকে নিত্য দিন সকালে সেটিকে যত্ন করে, সময় নিয়ে পরিষ্কার করতে দেখাটা এই কদিনে অভ্যাস হয়ে গেছে। আজও তার অন্যথা হয়নি। তাই এই সময়টুকুতে আমরা পঞ্চচুল্লি আর মুন্সিয়ারির আরও কিছু স্মৃতি লেন্সবন্দি করার সুযোগ পেলাম। নন্দাদেবী মন্দিরে যদিও দ্বিতীয়বার আর যাওয়ার সুযোগ হল না, কিন্তু ট্যুরের আসল লক্ষ্য খুল্যিয়া টপের ট্রেকিং সফল হওয়ায় কারোরই আর সেটা নিয়ে আক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে বিনসার হোক বা চৌকরি বা মুন্সিয়ারি, বিরথি হোক বা খুল্যিয়া টপ প্রতিটি জায়গারই নিজস্ব কিছু বৈচিত্র্য আছে যা তার স্বকীয়। বিনসারে জঙ্গল আর হিমালয়ের মেলবন্ধন, চৌকরিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তুষার, মুন্সিয়ারিতে পঞ্চচুল্লির অভিভাবকত্ব, বিরথির সিক্ত সৌন্দর্য্য আর খুল্যিয়া টপের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা, কুমায়ূন হিমালয় আমাদের মুগ্ধ করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রতিদিন একটু একটু করে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে অর্জন করা এইসব অভিজ্ঞতাগুলোকে বন্দি করার মতন ক্ষমতা মানুষের তৈরি কোন যন্ত্রের নেই। আর সেটাই বাঁচোয়া। নাহলে হিমালয়ের আকর্ষণও ফিকে হতে বেশিদিন লাগত না।

* বর্তমানে লেখক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুরের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

সিটি কলেজ

– অরিত্র গুপ্ত, দ্বিতীয় বর্ষ

আমি সিটি কলেজের ছাত্র। এই কলেজ নিয়েই দুই চার কথা আমি লিখছি। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, তৎকালীন পরিস্থিতি, কলেজ যে ধারায় বিবর্তিত হয়ে আজকের সিটি কলেজ হয়েছে এবং বর্তমানে তার পরিস্থিতি এইসবই প্রকাশ পেয়েছে এই লেখায়। যে ক্যালকাটা শুধু রাজ্যের নয় দেশেরও রাজধানী ছিল সেই ক্যালকাটা বর্তমান কলকাতার উত্তরভাগ, অর্থাৎ আজকের উত্তর কলকাতা। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আমাদের চিরপরিচিত ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার অঞ্চল। তখনও দক্ষিণ কলকাতা এতটা বিস্তার লাভ করেনি। ব্রিটিশ ক্যালকাটার বেশিরভাগ কার্যকলাপ তখন এই অঞ্চল জুড়েই। এই সময় গোরারা ভেবেছিল এ দেশ তারাই চিরকাল শাসন করবে, তাই এই native গুলোকে একটু কাজ চালানোর মত ইংরাজি শিখিয়ে নিলে আর তারা একটু বাংলা শিখে নিলেই রাজ্যপাঠ ভালই চালানো যাবে। তাই বিদেশি উদ্যোগে এই এলাকায় গড়ে উঠল বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে উল্লেখ্য এশিয়ার প্রথম মহিলা মহাবিদ্যালয় "Bethune College", "Scottish Church College", "Sanskrit College", "Presedency College", "Hindu College" ইত্যাদি। এই সমস্ত মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন বেশ কিছু চিরপরিচিত বাঙালি নাম- যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু (নেতাজী; স্বাধীনতা সংগ্রামী, Presedency College, Scottish Church College), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (স্বাধীনতা সংগ্রামী, Bethune College), ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সমাজ সংস্কারক, Sanskrit College) উল্লেখ্য। ভারতীয়দের স্বল্প শিক্ষিত করার যে পরিকল্পনা তৎকালীন বিলিতি সরকার করেছিল তাতে বাধ সাধে বাঙালি মেধা। বেশ কিছু বাঙালি ইংরাজি সাহিত্যে বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তারাই এদেশের শিক্ষার পথ পরবর্তী কালে প্রশস্ত করেন, যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় এর প্রতিষ্ঠিত Metropolitan Institution ছিল প্রথম ভারতীয়দের টাকায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয়দের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত ঘটনা নবজাগরন আনে বাংলায়। আর তখনই ব্রিটিশ বিতাড়নের পথও অনেকাংশে প্রশস্ত হয় তা বলাই বাহুল্য।

এতো গেল শিক্ষার প্রতি তৎকালীন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি, এবার আসি সামাজিক পরিস্থিতির কথায়। তখন পুরুষতান্ত্রিক বাংলায় হিন্দু ধর্মের নামে অধর্ম ও অত্যাচার উঠেছিল চরমে, নারীরা তাদের কাছে ছিল অবহেলিত, ছিল না নারী শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা। তারা ছিল অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত। গরীবরা তো চিরশোষিত বড়লোকদের কাছে, তখনও তাই ছিল। হিন্দু শাস্ত্রের রক্ষকরা তখন নিজেদের স্বার্থে সমাজটা কু-সংস্কারে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যে কিছু তো খুবই কুখ্যাত, যেমন সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ প্রথা ইত্যাদি। তখন কালাপানি পার করলে তাকে সামাজিক ভাবে ব্রাত্য করা হত। এমন যখন সামাজিক অবস্থা তখনই কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উদ্যোগে তৈরি হল ব্রাহ্ম সমাজ, যা ছিল এই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিপরীত। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রচার। ব্রাহ্ম সমাজের মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বোস প্রমুখ।

সেই সময় ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষার প্রসার হেতু যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন

তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল সিটি কলেজ। আনন্দমোহন বসু ১৮৮১ সালে এটি গড়ে তোলেন মূলত উন্নততর ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের জন্য। বর্তমান কলকাতার ১০২/১, রাজা রামমোহন সরনি তে রাজা রামমোহন রায় এর বসত বাড়ির নিকটেই এখনকার সিটি কলেজ। শুরু থেকেই এই মহাবিদ্যালয় অনন্য। প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে এখানে আইনি বিভাগ পড়ানো শুরু হয়। প্রায় সার্ধশতবর্ষ প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৮৪ তে প্রথম গ্র্যাজুয়েট কলেজ হিসাবে পরিচিত হয়। প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪০ বছর পর ১৯২০ সাল নাগাদ কলেজ থেকে প্রথম কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান

Old Calcutta

Presedency College

Bethune College

Vidyasagar

Netaji

Widow Burning

The Then City College

বিভাগে B.A ও B.Sc ডিগ্রি প্রদান চালু হয়। এরও ১৯ বছর পর ১৯৩৯ সালে যখন বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয় তখন এটি হয়ে ওঠে এশিয়ার বৃহত্তম কলেজ। ১৯৪৩ সাল নাগাদ খোলা হয় মহিলা বিভাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর ১৯৬১ সালের রেগুলেশনের আগে পর্যন্ত প্রায় ৮০ বছর ধরে এই কলেজের অধীনে আরও কিছু ব্রাহ্ম সমাজের কলেজ চলত, যা এই রেগুলেশনের পর ৭টি কলেজ এ ভাগ হয়ে যায় যথা-

1. Rammohan College (as morning branch)
2. Ananda Mohan College (as evening branch)
3. Umesh Chandra College
4. City College of Commerce & Business Administration
5. Shivnath Shastri College
6. Heremba Chandra College
7. Prafulla Chandra college

এর থেকে অনুমান করা একদমই কষ্টকর নয় যে এই কলেজের শাখা কত বিস্তৃত ছিল। এই কলেজ থেকে পাশ করা বহু ছাত্র আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল যেমন - অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন

অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দ, বর্তমান পত্রিকার Founder Editor বরুণ সেনগুপ্ত, কবি রজনীকান্ত সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এই কলেজেই শিক্ষকতা করেছেন জীবনানন্দ দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের মত শিক্ষকেরা।

আমি এই কলেজে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হই। মনে আছে ১৬ নম্বর রুমে আমাদের প্রথম দিনে প্রথম পরিচয় হয় বিভাগীয় প্রধানা সহ অনান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও শিক্ষকদের সাথে। সেই থেকে এক সঙ্গে পথ চলা শুরু। এ যেন এক বিশাল পরিবার, নতুন কলেজে Ragging নামক বস্তুর ভয় একটু থাকেই কিন্তু এই কলেজে আর সেই বস্তুর সাথে পরচয় হয়নি; সিনিয়ররা এতটাই ভালো। সেই সময় সব মিলিয়ে প্রায় ৭ জন শিক্ষক ছিলেন কিন্তু ম্যাডামদের কাছে শুনেছি এক সময় আমাদের ৪ নম্বর রুমে ১৫-১৬ জন নামকরা অধ্যাপক একসঙ্গে থাকতেন। ভাবতেও অবাক লাগে আমরা যে ল্যাব এখন ব্যবহার করছি তা বহু দিকপাল অধ্যাপকের স্পর্শে ধন্য।

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি ঢুকেছে, বেড়েছে ছাত্রসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ, নষ্ট হয়েছে একসময়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব থেকে বড় ছাত্রাবাস সিটি কলেজের ছাত্রাবাস, একটা কলেজ বিল্ডিং এ তিনটে কলেজ হওয়ায় পুরানো মহিমা এই কলেজ নিশ্চয়ই হারিয়েছে কিন্তু হারায়নি কলেজের প্রতি ছাত্রদের ভালবাসা যেটা বিল্ডিং পুরানো হলেও এখনও পুরানো হয় নি।

Ananda Mohan Bose

Soumitra Chattopadhay

Shakti Chattopadhay

Jibananda Das

Chittaranjan Dasgupta

Present City College

COMPUTER as the BEAUTY and the BEAST

– Durlov Dutta, 2nd Year

"Everything is beautiful until you see the dark side of it."

ইংরাজিতেই লিখতে পারতাম। কিন্তু দুটো বিষয় মাথায় রেখে লিখলাম না। প্রথমত, আমার ইংরাজি জ্ঞান এতটাও প্রকট নয় যে কোনো রচনা ইংরাজিতে লিখে বোঝাতে পারব। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষা আমার কাছে গর্বের বিষয়। তাই শিরোনাম বাদে পুরোটাই বাংলায় লিখতে পারলে আমার ভালো লাগবে।

কম্পিউটারকে আর রোখা যাবে না। দিন এগোনোর সাথে কম্পিউটার বিজ্ঞান সমস্ত মানবজীবনে এত বিশাল প্রভাব ফেলছে যা হয়তো অন্য কোন কিছু দ্বারা substitute করার কথা কারোর মাথায় কোনোদিনও আসবে বলে মনে হয় না। অবশ্যই কম্পিউটারের নাম বর্তমান যুগে বাচ্চা থকে বুড়ো, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, ধনী থেকে দরিদ্র কারোরই জানার বাইরে নয়। শিরোনামের Beauty কথাটিকে আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। ব্যাংকে কম্পিউটারের মাধ্যমে কীভাবে মিনিটের মধ্যে টাকা লেনদেন হয়, রেলের দূর-দূরান্তের টিকিট কীভাবে কাটা হয়, কীভাবে খোল-নলচে পাল্টে দেওয়া যায় কোনো ছবির, তা আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু Beast!! সেটা নিয়েই আমাদের আলোচনা। কম্পিউটারের খারাপ কিছু প্রভাব নিয়ে নয়, আমাদের আলোচনা কম্পিউটার ব্যবহারের শারীরিক ক্ষতিসমূহ ও তার প্রতিকারকে নিয়ে। এ সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের সাথে কম্পিউটারের সখ্যতা আরও সুগম করবে, নিশ্চিত করবে, স্থায়ী করবে।

- Nerve: অফিসে একনাগাড়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাড়ি এসে দেখা গেল আড়ষ্টতা, আঙুলে ঝিনঝিনে ভাব। ব্যথার ওষুধ, মালিশ তেল, সেঁক কিছুতেই ফল হল না। তখন বাত মনে হতে পারে। কিন্তু Experienced Doctor-রা বলছেন এ রোগের নাম রিপিটিটিভ স্ট্রেন ইনজুরি (RSI)। এর কারণ, আঙুলের ঐ সমস্ত নার্ভ সারাদিন চাপের প্রকোপ নেয়। বারবার সংকোচন-প্রসারণের ফলে ঐ নার্ভ শিথিল হতে পারে। ঠিক সময় প্রতিকার না করলে এই ক্ষতি বাড়তে থাকে। RSI একটি Stage অতিক্রম করলে শরীরে প্যারালাইসিস হতে পারে। এর প্রতিকার হল মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া ও ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত কিছু ওষুধ ব্যবহার করা।
- চোখ: চোখ আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমস্ত কম্পিউটার পেশাদাররা কখনও না কখনও চোখের সমস্যায় ভোগেন। মাথার যন্ত্রণা, চোখ থেকে জল পড়া, দ্রুত চশমার Power বাড়া, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পারা এর ফল। এই রোগকে American Optometric Association একত্রে নাম দিয়েছে Computer Vision Syndrome.

কারণ: বাংলায় বলে ঝলকানি। কম্পিউটার স্ক্রিনের glare-ই চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। অতিরিক্ত উজ্জ্বল স্ক্রিনও চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। একটানা তাকালেও এই রোগ হতে পারে। আবার মিনিটে যার যত বেশী চোখের পলক পড়ে তার এই রোগের সম্ভাবনা তত কম। কারণ পলক পড়ামাত্র নেত্রনালীর জল ভিজিয়ে দেয় ওপরের স্তরকে। কম পলক পড়া মানে কর্নিয়া শুকিয়ে যাওয়া ও চোখ জ্বালা করা বা করকর করা।

প্রতিকার:

i. মনিটরের কন্ট্রাস্ট, ব্রাইটনেস, রঙের তীব্রতা কমিয়ে রাখতে হবে।

ii. মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে দূরের কোন গাছ, বাড়ি, দেওয়াল ইত্যাদির দিকে তাকানো দরকার (১৫ মিনিট অন্তর)।

iii. বছরে একবার চোখের ডাক্তারের কাছে যান; সমস্যা থাক বা না থাক। সমস্যা থাকলে তিন মাস অন্তর একবার পরামর্শ নিন।

iv. কোন কাগজ দেখে type করতে হলে তাকে স্ক্রিনের পাশে Copy Holder-এ রাখুন, যাতে চোখের উপর চাপ না পড়ে।

v. Screen-কে চোখ থেকে 20-30 inch দূরে রাখুন।

vi. মাঝে মাঝে চোখে জলের ঝাপটা দিন, যাতে চোখের পালক ভিজে থাকে।

- শিরদাঁড়া: কাজের জায়গায় শিরদাঁড়া ঠিকমতো রাখাও একটা আর্ট। আমিই তো স্কুলে শিরদাঁড়া সোজা রাখতে না পারায় অনেক বকাঝকা খেয়েছি। কম্পিউটার ব্যবহারকারীদেরও শিরদাঁড়ার সমস্যা হতে পারে। তার জন্য বিশেষ কিছু প্রতিকার হল –

  i. মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ঘাড় ও কোমরের Free Hand ব্যায়াম করুন।

  ii. অ্যাডজাস্ট করা যায় এমন চেয়ার ব্যবহার করুন।

  iii. পা যেন ঝুলে না থাকে। ফুটরেষ্ট বানিয়ে নিন দরকারে।

  iv. ডেস্কের উচ্চতা যেন চেয়ারের সাথে একটা Level এ থাকে, যাতে ঘাড়ের ওপর বেশি চাপ না পড়ে।

  v. Bi-focal চশমা পরে Computer বেশি ব্যবহার না করাই শ্রেয়। এতে অযথা ঘাড় ও চোখে চাপ পড়ে। আলাদা পুরো মাপের Reading Glass ব্যবহার করুন।

- চামড়া: বিশেষজ্ঞদের মতে ছোট আলো-বাতাসহীন ঘরে Computer ব্যবহার করা উচিত না। এতে মুখের চামড়ায় র‍্যাশ বেরনোর সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া যে Static Charge তৈরী হয় তা চামড়ায় প্রভাব ফেলে। তবে ঠান্ডা ঘরে কাজ করলে Static Charge চামড়ায় প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু আলো-বাতাসহীন ঘরে কাজ করা একদমই ঠিক নয়। কিবোর্ডে হাত দেওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধোয়া উচিত। কারণ অ্যারিজোনা University র Microbiologist Dr Kedli Renolds বলেছেন, তার পরীক্ষায় বেশিরভাগ কিবোর্ডে থুতু, মূত্রের অবশিষ্টের অস্তিত্ব মিলেছে, যার ফলে সংক্রামক ব্যাধি ছড়াতে পারে। তাই কাজের আগে ও পরে সাবানের দ্বারা হাত ধোয়া উচিত।

তো এই ছিল মোটামুটি সাবধানতার উপায়গুলি। কম্পিউটার ছাড়া আমরা বর্তমানে অচল। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কম্পিউটার ব্যবহার যেন আমাদের কম্পিউটার ব্যবহার করা থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়। আগামী দিনে আরও অত্যাধুনিক কম্পিউটার আসবে এবং কর্মব্যবস্থা আরও সহজ ও দ্রুততর হয়ে উঠবে। তাই কম্পিউটার সচেতন আমাদের সকলকে হতেই হবে।

তথ্য সংগ্রহ:-

1. Dr. Devanjan Sengupta (Computer Expert).
2. American Optometric Association (Wikipedia).
3. Arpan Kumar Maity (M.C.A.) (Teacher, Bally Jora Aswatthatala Vidyalaya).

অভিমান

- শুভদীপ কাজলি, প্রথম বর্ষ

সেদিনও এসেছিল বসন্ত
হৃদয়ে ছিল ভালোবাসা অফুরন্ত-----
তুমি আসবে বলে----
এনেছিলাম ফুল - রজনীগন্ধা, গোলাপ,
কৃষ্ণচূড়া,
লিখলাম কবিতা, গান ও ভালোবাসার ছড়া।
কিন্ত তুমি এলে না।
কিন্ত আজ একটা কথা,---
বলব তোমায়,
ভালোবাসা দাও,
আমার মনের আঙিনায়,,
ব্যাথা যেন দিও না।
জানি কোন একদিন তুমি আসবেই
সুন্দর – সোনালী - সৌন্দর্যময় সকালে---
হয়তো বা মরণের পরেও,,,
যদি তুমি আস ফিরে
এই কবিতা, গান, তোমায়
রাখবে ঘিরে।।
হয়তো পাবে না আমায় পাশে
শুধু স্মৃতিগুলোই থাকবে, তোমার
মনের ইতিহাসে।।

ডায়েরির পাতা

- শুভদীপ দে, দ্বিতীয় বর্ষ

আমার সেই পুরানো একখানি ডায়েরি
খুঁজে পেলাম আজ।
যতই পুরানো হোক না কেন, তবুও তা আমার।
থাকুক না তাতে কাটাকাটি, অগোছালো
অক্ষরবিন্যাস, তবুও তা আমার।
বুকে জমে থাকা, না বলা কথাগুলির,
প্রকাশমাধ্যম আমার সেই পুরানো ডায়েরি।
ব্যর্থ হয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলির,
পূরণের সেই ছোট্ট চাবিকাঠি হল!
আমার সেই পুরানো একখানি ডায়েরি।
আজ আর তেমন লেখা হয় না।
সময়ের বড়ো অভাব। তবুও,
সময় পেলেই লিখতে বসে যাই।
পুরানো ডায়েরিটি কবেই শেষ হয়ে গেছে।
নতুনটিও শেষ, এখন তো আবার
ল্যাপটপ, ডেস্কটপের যুগ।
তবুও সবচেয়ে ভালো আমার সেই
পুরানো ডায়েরি।
ছোটবেলার নানা অজানা কথার
প্রকাশমাধ্যম।।

সান্ধ্য আড্ডা

– সায়ক ঘোষ, দ্বিতীয় বর্ষ

"কী বলেন মশাই, আপনি নিজের চোখে ভূত দেখেছেন?!!!", বেশ অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন রথীনবাবু। "কেন পারেন না, যিনি অমাবস্যা রাতে মাঠের মাঝে দুজন মানুষকে খেলতে দেখতে পারেন তিনি সবই পারেন", বেশ খোঁচা মেরেই বললো সুরেন। অতীনবাবু সুরেনের কথায় একটু চোটে গিয়েই বললেন, "আলবাৎ দেখেছি। তোমার মতো তো আর ঘরের ছেলেটি হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারি না।" রথীনবাবু প্রত্যক্ষ ভূতদর্শনের গল্প শুনতে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তিনি দুজনকেই থামিয়ে বললেন, "আরে আপনারা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা থামান। অতীন বাবু, আপনার ভূত দর্শনের কথাটা বলুন।"

ওহ দেখছেন আপনাদের কাছে তো রথীন বাবু, অতীন বাবু, সুরেন এনাদের পরিচয় দিতেই ভুলে গেছি। রথীন বাবু হচ্ছেন হরিহরপুরের শিক্ষক, সুরেন একজন মুদিখানার মালিক আর অতীন বাবু একজন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার। তিনি বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরেই থাকেন। তিনজনের মধ্যে বয়সের অনেক পার্থক্য থাকলেও কিভাবে যেন তাঁদের মধ্যে বেশ ভাব। সবাই একসাথে হলেই সন্ধ্যেবেলা আড্ডায় নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। আজ হচ্ছে ভূতের কথা। রথীন বাবু ভূতে খুব একটা ভয় না পেলেও ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। অন্যদিকে সুরেন কোনোভাবেই ভূতের কোনোপ্রকার অস্তিত্ব মানতে নারাজ। এর মধ্যে আবার অতীন বাবু বলে বসেছেন যে, তিনি নিজের চোখে ভূত দেখেছেন। তাই নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলছে।

রথীন বাবু আবার বললেন, "কি হল বলুন অতীন বাবু।" অতীন বাবু গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "বলতে পারি, যদি সুরেন ফোড়ন না কাটে।" রথীন বাবু বললেন, "না না ও আর কিছু বলবে না। আপনি শুরু করুন।" সুরেন উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে। সে কোনো কথা বললো না। অতীন বাবু বলতে শুরু করলেন, "সেবার একটা কাজে বেনারস গিয়েছিলাম সেখানে গিয়েই দেখেছিলাম।" রথীন বাবু বললেন, "সত্যিকারের ভূত?!!" অতীন বাবু বললেন, "সত্যি নয়ত কি মিথ্যে। এত প্রশ্ন করলে গল্প বলা যাবে না মশায়।" রথীন বাবু বললেন, "না আর কোনো প্রশ্ন করব না। শুরু করুন।" চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে অতীন বাবু আবার বলা শুরু করলেন, "সেবার টুরিস্টদের খুব ভিড় ছিল। তাই অনেক খুঁজেও কোনো হোটেলেই রুম ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ আশা নিয়ে গেলাম হোটেল গ্রীন প্যালেসে। আমার বিদেশ বিভুঁই-এ এসে রুম না পেয়ে বিপদে পড়ার কথা হোটেল ম্যানেজারকে গিয়ে জানালাম। সব শুনে হোটেলের ম্যানেজার ব্যাজার মুখে বলল, "আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুবই ভালো লাগত। কিন্তু কি করবো বলুন কোনো রুমই ফাঁকা নেই।" এমনসময় এক রুমসার্ভিসের ছেলে বলল, "স্যার, ২০৬ নং রুমটা তো-" তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ম্যানেজার বলল, "কি বলছো কি, উনি বিপদে পড়েছেন বলে তো আর ওনার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না।" আমি বললাম, "কি ব্যাপার রুম আছে অথচ দিতে চাইছেন না?" উনি বললেন, "আরে না না, ওরুম আজ প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ পড়ে আছে। ও জানে না তাই-" আমি বললাম, "তো কি, আপনি একটু ঝাড়িয়ে পরিষ্কার করিয়ে দিন না। এক রাতের তো ব্যাপার।" ম্যানেজার বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন

না। ও রুমে কেউ থাকতে পারে না বলেই ওটা বন্ধ আছে। ও রুমে অশরীরী আনাগোনা হয়।" এবার আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, "আরে মশাই রাখুন তো আপনার অশরীরী। ভাড়া কত নেবেন বলুন। আমি ওই রুমেতেই থাকবো। যদি তেমন কারুর সাথে দেখা হয় তো রাতটা তার সাথে গল্প করেই কাটিয়ে দেব। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে। কি বলেন?" বলে হাসতে লাগলাম। এরপর ম্যানেজার আর জোরাজুরি করলেন না। আমি একবারে রাতের খাবার খেয়ে চলে এলাম রুমে। রুমটা বেশ বড়ো। ঝেড়ে পরিষ্কার করে সুন্দর বিছানা পেতে দিয়েছে। আমি আর দেরি না করে শুয়ে পড়লাম। রাত তখন আন্দাজ ১টা হবে হঠাৎ কিছু হাততালি আর হাসাহাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বেলে চারিদিকে দেখলাম। কই, সব তো ঠিকঠাকই আছে। ভাবলাম মনের ভুল। হয়তো সারাদিনের ক্লান্তির জেরে এমনটা হচ্ছে। একটু জল খেয়ে নিয়ে আবার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষন কেটেছে জানিনা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি, আবার সেই আওয়াজ। এবার যেন একটু জোরেই। না ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হচ্ছে। আলো না জ্বালিয়ে শুয়ে থেকেই চারদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম কি ঘটছে। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেউ কি আছে?" কোনো উত্তর নেই। আবার চোখটা বন্ধ করতে যাচ্ছি ঠিক সময় আবার সেই হাততালি আর হাসাহাসি। এবার একটু ভয় পেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, "কেউ থাকলে দয়া করে উত্তর দিন।" একটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "নমস্কার স্যার।" আওয়াজটা খুব কাছ থেকে এসেছে। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে বললাম, "কে? কে তুমি? কী করছো এখানে?" উত্তর এলো, "স্যার, আমি শংকর জোকার। বাচ্চাগুলোকে একটু খেলা দেখাচ্ছি।" ও তাহলে ভূত ফুত নয়, জোকার। এইভেবে মনে সাহস এলো। তারপর রাগও হল রাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে খেলা দেখাচ্ছে শুনে। রেগে মেগে বললাম, "এত রাতে খেলা দেখাচ্ছো! ইয়ার্কি!! কোথা থেকে এসেছো? আর এলেই বা কিভাবে? আর আছোই বা কোথায় তোমরা?" বলে আলোটা জ্বালতে গেলাম। শংকর বলে উঠল, "দয়া করে অমন কাজটা করবেন না বাবু। তাহলে আমরা আর এখানে থাকতে পারবো না। আর আমরা না চাইলে আমাদের কেউ দেখতে পায়না। কারণ আমরা অন্য জগতের বাসিন্দা।" এবার আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "মানে??!!!! তোমরাই কি এই রুমের বাসিন্দা।" আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা শংকর কিভাবে জানি বুঝে বলল, "ভয় পাবেন না স্যার, আমরা কারো কোনো ক্ষতি করিনা শুধু নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করি আর মাঝে মধ্যে কেউ এলে তাদের সাথে একটু রসিকতাও করি।" আমি এবার স্বাভাবিভাবেই প্রশ্ন করলাম, "তোমার বাড়ী কোথায় ছিল?" শংকর বলল, "কলকাতার কাছে একটা মফঃস্বলে।" আমি বললাম, "তা এখানে কিভাবে এলে?" সে বলল, "কি আর বলবো দুঃখের কথা ছোট থেকে সাধ ছিল মনে বড়ো অভিনেতা হবো। কিন্তু ঠাকুর তা হতে দিলেন না। আমাকে তিনি বামন করেই পাঠালেন। সিনেমার জায়গায় ঠাঁই হলো সার্কাস দলে। অনেকবার চেষ্টা করেও কিছু হচ্ছিল না। সবাই অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করলেও সুযোগ দিতেন না। একবার তো কয়েকজন বলে বসলেন এই চেহারায় সিনেমা নয় সার্কাসই হয়। ক্ষোভে দুঃখে বেনারসে বাবার মন্দিরে এলাম নালিশ জানাতে। আর ভাগ্যের কী পরিহাস বলুন, তিনদিনের জ্বরে এই রুমেতেই শেষ। মরণশয্যা তো তাই আজও ছেড়ে যেতে পারিনি। ভূত সমাজে ৫ বাচ্চার সাথে পরিচয় হয়। তাদেরও এখানে নিয়ে আসি। সেই থেকে এখানেই আছি।" আমি বললাম, "তা একবার খেলা দেখা যায় কি?" শংকর বলল, "কেন নয়।" একটা নীলাভ আলোর আভায় দেখলাম একটা ৪ ফুটের লোক খেলা দেখাচ্ছে আর ৫ টা বাচ্চা মোহিত হয়ে দেখছে। তার অঙ্গভঙ্গি দেখে হেসে হেসে পেটে খিল ধরে যায়। খেলা দেখে আমি বললাম, "বাহ, তুমি তো

বেশ বড়ো মাপের শিল্পী হে। তা একটা অটোগ্রাফ পাওয়া যাবে কি তাহলে বন্ধুদের দেখাতে পারতাম প্রমাণস্বরূপ।" সে বলল, "কেন নয়।" বলে একটা সাদা কাগজে সে নিজের নাম লিখে দিল। আস্তে আস্তে ভোর হয়ে আসছিল। শংকর বলল, "স্যার, এবার আমাদের যেতে হবে। আবার কখনো এলে দেখা হবে। বিদায়।" আস্তে আস্তে শংকরের অবয়ব হাওয়াতে মিলিয়ে গেল।"

গল্প শেষ হতে সুরেন জিজ্ঞাসা করলেন, "তা সেই অটোগ্রাফ গেলো কোথায়। হারিয়ে ফেলেছেন নিশ্চয়।" অতীন বাবু জোর গলায় বললেন, "একদমই তা নয়। সেটা আমার কাছেই আছে।" রথীন বাবু এবার খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আছে?! কোথায় আছে? একবার দেখান না।" "দাঁড়ান", বলে অতীন বাবু পকেটের কাগজপত্র হাঁতড়ে একটুকরো কাগজ বেঞ্চের ওপর রাখলেন। রথীন বাবু আর সুরেন সেটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথাও কোনো অটোগ্রাফ দেখতে পেল না। অতীন বাবু মুচকি হেসে বললেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছেন নাতো, দাঁড়ান।" বলে কাগজটা নিয়ে তাতে সুন্দর করে লিখে দিলেন 'শংকর'। সুরেন বিরক্তির সুরে বলল, "এটা কি হল?" অতীন বাবু এবার হো হো করে হেসে বললেন, "চটছো কেন ভায়া, গল্পটা যখন আমার অটোগ্রাফ দেবার দায়িত্বটাও তো আমারই নাকি?" রথীন বাবু অবাক হয়ে বললেন, "মানে! পুরোটাই বানানো গল্প!" সুরেন বলল, "আগেই বলেছিলাম, ভূত ফুত কিছুই নেই।" অতীন বাবু তাকে খোঁচা মেরে বললেন, "কেন, তুমিও তো বাপু সত্যি বলে প্রায় গিলে নিয়েছিলে আরকি। তাছাড়া গল্পটা হতে হতে সন্ধ্যের আড্ডাটা তো খারাপ হল না। কি বলেন রথীন বাবু?" রথীন বাবু ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে একটু হতাশই হয়েছেন। তাই শুকনো গলায় বললেন, "তা তো হল। কিন্তু আপনি মশাই বেশ হতাশ করলেন। ভেবেছিলাম ভূত সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে হয়তো আসতে পারবো। কিন্তু তা আর হল না। যাক সে আর কি করা যাবে, তবে গল্পটা বেশ ছিল। সন্ধ্যেটা বেশ ভালোই কাটলো।" সুরেন এখনও রেগে উল্টো দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অতীন বাবু বললেন, "কি সুরেন ভায়া, কি হল হে তোমার।" সুরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই অতীন বাবু সুর করে বলে উঠলেন, "খেয়েছো গল্পের দানা, তা বলে কি হবে রামগরুড়ের ছানা!" কথাটা শুনে সুরেন ও রথীন বাবু একসাথে হেসে উঠলেন।

– Sourav Banik, Ex. Student

– Sourav Das, 2nd year

তাই বলে কি প্রেম দেবো না ?

– সৌম্য মুখার্জী, তৃতীয় বর্ষ

লাল্ মাটির দেশ। মফঃস্বল এলাকা। গ্রামের স্কুলগুলো সাধারণত যেমন হয় এটা ঠিক তেমনটা নয়। প্রায় ২০ বিঘা জায়গার উপর গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে জেলার অন্যতম বিশাল ক্যাম্পাস। নাসার সায়েন্টিস্ট থেকে শুরু করে আই.আই.টি.-র ডিরেক্টার, কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা-রাজ্য স্তরে বিভক্ত-অবিভক্ত বাংলায় মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের র‍্যাঙ্ক, সাংসদ, বিধায়ক সব দিয়েছে এই স্কুল। আবার দাগি, থাক সেসব কথা। যাইহোক স্পেকট্রাম বেশ চওড়া। ৬টা ব্লক যার কোনোটা দোতলা কোনোটা তিনতলা। দুটো নতুন ব্লক বাদ দিলে প্রায় সবগুলো ব্রিটিশ আমলের তৈরি। বড় বড় উঁচু পিলার, উঁচু সিলিং, রেলের পটরীর মত লোহারবিম দিয়ে ঢালাই করা ছাদ। প্রতিটা ব্লকে ১০-১২টা বড় হলঘর। কাঠের গুলো ভেঙ্গে যেত বলে নতুন করে লোহার তৈরি বেঞ্চ আনা হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান সব ঘরেই আছে। এককালের জেলার অন্যতম উন্নত মালটিপারপাস স্কুল এখন অনেকটাই সৌন্দর্য হারিয়েছে, তাও দেখতে গেলে শহরের নামি দামি অনেক স্কুলকে দশ গোল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বৃদ্ধ স্কুল। ৫টা খেলার মাঠ, ক্রিকেট, ভলি, অ্যাথলেটিক্স সব গুলোর জন্যই আলাদা আলাদা। ভোকেশনাল এডুকেশান সেন্টার, কম্পিউটার ল্যাব, হাইটেক কনফারেন্স রুম সবই প্রায় আছে। তবে ঐ যে সাম্রাজ্য বড় হলে বিশৃঙ্খলা তো হবেই, হয়েছেও তাই। কখনো বিভীষণের দল, কখনও বা বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের ফলস্বরূপ পদ্মফুলের মত বাঁকানো ফ্যান, ভাঙ্গা বেঞ্চের কঙ্কাল দেখতে পাবেন। কখনো হাইস্কুলে পদার্পণ করা কোন মহামহিম প্রথম দিন শেখা, শোনা, অজ্ঞাত অথচ আকর্ষণীয় বীভৎস বানীখানি খোদাই করেছে। কোন কোন দেওয়ালে হৃদয়ের রঙ, কোনটায় মারকুটে স্যারের উপর যাবতীয় রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখবেন। এক কথায় দেওয়ালগুলোও বেশ বৈচিত্র্যময়। .....।।

যাইহোক এপ্রিল মে মাস। তখন টিফিন চলছে। টিফিন বলতে ১টা ৪০ থেকে ২টো ২০ মিনিট। গনগনে গরম। যাদের বীরভূমে থাকার অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন এখানে গরম বলতে জাঁদরেল গরমকেই বোঝায়। প্রকৃতি হোক বা জীবন সব কিছুকেই যেন তীব্র তাপপ্রবাহ গিলে খেতে চায়। বছরের এই সময়টা কেমন যেন শুকনো, খটখটে, নিরস মেজাজে ভোগে প্রায় সবাই। প্রকৃতির সাথে যেন নিরন্তর একটা সংগ্রাম। শরীরের শেষ জলবিন্দুটা বাঁচানোর একটা চরম প্রয়াস চোখে পড়বে সবার মধ্যে। সবাই ধুঁকছে। মানুষ, গরু, ছাগল সবাই। তাই শরীর ঠাণ্ডা রাখা কঠিন। তবে মেজাজ ঠান্ডা রাখা কঠিনতম। .....।।

এই বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট তথা হেডমাস্টারের দর্পে, শৌর্যে পড়াশোনার পরিবেশ কিন্তু অমলিন, এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। লুকিয়ে ফ্যান ভাঙুক বা লাইট ফাটাক, দেওয়াল লিখন করুক, যাই করুক না কেন, স্যারের সামনে টু শব্দটি কেউ করেনা।

টিফিন চলছিলো। ৬টা অফিসিয়াল গেট টিফিনে খোলা হয়, শেষ হলে আবার বন্ধ। যদিও ২০ বিঘা জমির লম্বা বাউন্ডারি ওয়াল অসংখ্য আন-অফিসিয়াল গেট তৈরি করেছে যা সিস্টেমকে ওপেন সিস্টেম করে রাখে ২৪ ঘণ্টা। গ্রামের স্কুল। নগদ টাকা আনার ব্যাপারটা কম এদিকে। টিফিনের সময় কেউ কেউ সাইকেলটি নিয়ে টুক্ করে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসে, কেউ পাশের পাড়ায় আম পাড়তে যায়।

স্কুলের বাউন্ডারির বাইরে হোস্টেল, কেউ যায় প্রাণের বন্ধুর সাথে আড্ডা মারতে। কেউ স্পোর্টস টিচারের কাছে বল, ব্যাট, নিয়ে একটু আধটু প্রাকটিস্ করে। সেদিনও চলছিলো পুরোদমে।

ইউনিট টেস্ট শুরু হয়েছে তিন বছর হবে হয়ত।

বাংলার শিক্ষক নিত্যানন্দবাবু একটু চাপে আছেন। চাপ বলতে সিলেবাসের চাপ। এইটের সিলেবাস শেষ হয়নি, ক'দিন পরেই আবার ইউনিট টেস্ট। শেষ করতে হবে। স্কুল জীবনে আমরা শিক্ষকদের মূলত তিন ভাগে ভাগ করি, ১. রাগী, ২. বন্ধু-বন্ধু, ৩. রহস্যময়। এই তৃতীয় ক্যাটেগরির স্যার বা ম্যাডামরা মূলত বয়স্ক। কথা বলেন কম, হাসেননা, বকেন না। কেউ মারতেও দেখেনি কোনোদিন কাউকে, কেউ মার খেয়েছে এরকমও শোনা যায়নি। বিরক্তি বা রাগ প্রকাশের মাধ্যম বলতে, চশমার উপর দিয়ে অদ্ভুত একটা তাকানি সঙ্গে গম্ভীর স্বরে 'বেরিয়ে যাও', আর ওতেই কাজ হয়, ওতেই ছেলে ঠাণ্ডা, তা সে ৫-এর কচি হক বা ১২-এর আদ্যপ্রান্ত পাকাটে। গুরুগম্ভীর একটা ব্যাপার। কি করবেন কোন পরিস্থিতিতে সেটা আন্-প্রেডিক্টেবেল, তাই রিস্ক নেয়না কেউ। আন্-প্রেডিক্টেবিলিটি একটা বড় অস্ত্র ব্যক্তিত্তের, আর ১৮-এর কম বয়সি ছেলে মেয়ে রিস্কই বা কি নেবে। তাই এই তৃতীয় ধরণের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে সর্বজনবিদিত হন, শ্রদ্ধাও পান ঢালাও। এই নিত্যানন্দবাবু ছিলেন ঐ সর্বজনবিদিত তৃতীয় ক্যাটেগরির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সবাই বেশ সমীহ করে চলে। .....।

উত্তরবঙ্গে যাবেন, দুপুরের দিকে খেয়ে দেয়ে বেরবেন, মনোরম আবহাওয়ায় পরিচিত কাউকে দেখবেন, সে আহ্লাদে গদোগদো হয়ে এগিয়ে আসবে, ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে বলবে, "কি দাদা ভালো আছেন?" কোলকাতার মধ্যে আত্মিক টানটা কম হলেও লোকদ্যাখানিটা অনন্য। একই পরিস্থিতিতে এক গাল হেসে বলবে, "অ বাবা, কতদিন পর, ভালো তো?" আর যাবেন একবার বীরভূম, দুপুরে বেরবেন, পরিচিত লোকটা দেখলে বলবেনা কিসসু, হাল্কা ঠোঁট বেকিয়ে, ঘাড় নাড়িয়ে নিঃশব্দে খবর নেবে। আত্মিক টান নেই তাও নয়, লোক দ্যাখানি জানেনা তাও নয়। আসলে ক্যালোরি সঞ্চয়, জল সঞ্চয়। কারণ দুপুর দুটো পর্যন্ত বরুণ দেব তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা ডিহাইড্রেসান যাই বলুন, আপনার সাথে সম্পর্ক রাখতে অন্তত নিজের প্রাণটা ঐ দুজনের হাতে দেবে না। লোকটা পঞ্চাশোর্ধ হলে তো কোন কথাই হবেনা। সবাই ধুঁকছে। .....

নিত্যানন্দবাবু চললেন দোতলায়, মেন বিল্ডিং-এর দোতলা, স্কুলের দক্ষিণতম প্রান্ত। ছেলেরা তখনও মাঠে। তাড়াতাড়ি চললেন, সিলেবাস শেষ করতে হবে। প্রায় ৬ ফুট লম্বা বিশাল শরীর, ধীর স্থির পদক্ষেপ, হাতে বই আর বাঁশের লম্বা কঞ্চি, যেটা কোনোদিন কেউ ব্যবহার হতে দেখেনি এখনও। ইস্ত্রি করা কালো প্যান্ট, সাদাকালো হাফ হাতা চেক কাটা জামা। স্যার চল্লেন, সিঁড়ি দিয়ে। দোতালায় উঠলেন। লনটা প্রায় ফাঁকা। ক্লাসেও ছেলেরা ঢোকেনি, সবাই প্রায় মাঠে। ডানদিকের উইং-এ কয়েকটা ছেলে ছিল, স্যারকে দেখে শুরশুর করে ঘরে গিয়ে বসলো। ক্লাসে আনতে অনুঘটক লাগত বেশিরভাগ দিন, মানে কোন একজন মারকুটে স্যারকে বেরোতে হত, গোয়ালে গরু ঢোকাতে। সেদিন অবশ্য ততদুরও যায়নি ঘড়িরকাঁটা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবুক ছেলে জগাই। শুধুই ভাবে। এমনিতে শান্ত, ভদ্র, ছোটোখাটো, শ্যামবর্ণ জগাই। বারান্দায় কোন গ্রিল নেই। কংক্রিটের বুক সমান উঁচু প্রাচীরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দুরের কিছু দেখছে। দোতলার বাঁদিকের উইং-এর শেষ ঘরে স্যারকে যেতে হবে। জগাই দাঁড়িয়ে ঐ ঘরেরই কাছাকাছি। ঐ ক্লাসেরই ছাত্র, স্যারও চেনে ওকে। .....

অবসর সময়ে জগাই একটা বাঁশের বাঁশি নিয়ে বাজায়, ভালোই বাজায়। ভাল গল্প বলে। আর ভাবে তার থেকেও বেশী, উদাসীন হয়ে। হয়তো কিছু পড়ার চেষ্টা করে ওর আশপাশটায়। যার তার চোখে যা ঠেকেনা, তাই হয়তো পড়ে। সেদিন তাকিয়ে ছিল গুরুপল্লির দিকে। স্কুলের দক্ষিণ দিকটায়। ওখানে স্যাররা থাকেন, টিচারস্ কোয়ার্টারস্, স্কুল ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরেই। স্টুডেন্টস্ হোস্টেল-ও ওখানেই। স্কুল থেকে গুরুপল্লিকে আলাদা করেছে রেললাইন, ন্যারোগেজ। দিনে দুটো ট্রেন যায়। টিফিনের সময় যেদিন অসময়ে এসে পড়ে সেদিন দেখার মত জিনিস হয়। বলা ভাল প্রতিদিনই অসময়ে আসে। কি আন্তরিক শত্রুতা জানা যায়না, তবে ছেলেরা কয়েন, ইট, পাথর, যা পারে এনে চাপিয়ে দেয় ট্র্যাকে। কেস জন্ডিসের পর্যায়ে গেলে ট্রেন দাঁড় করাতে হয়। সপ্তাহে দুদিন রেলের অফিস থেকে লোক আসে, কমপ্লেন করে, হেডমাস্টারের হেড ঝোঁকে লজ্জায়, পরদিন থেকে মারকুটে দু একজন স্যার ট্রেন এলে গেটের সামনে দাঁড়ান, তৃতীয় দিন সেই দেখে ছেলেরা শান্ত থাকে, চতুর্থদিন স্যার থাকেননা, আবার ট্রেন থামে। মানে জনসচেতনতা বাড়ানো যায়না। সেদিন থামলনা। মানে সামাল দেবার লেভেলই আছে। তবে স্পীড কুড়ি কিমি থেকে পাঁচ কিমি প্রতি ঘণ্টা হল। এ এক অনন্য সুযোগ। ছেলেদের মধ্যে যারা দু একজন দাদা হবে বলে বেশ বদ্ধপরিকর, ট্রেনের পা-দানিটা হাত দিয়ে কষিয়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে যায় খানিকটা দূর, যেন নায়ক। কিছুদূর পর নেমে, জামার উপরের দুটো বোতাম খোলে, ঝর্-ঝর্ করে মাথার দুপাশ দিয়ে বইতে থাকা ঘামে হাত ভিজিয়ে চুলগুলোকে আঙ্গুল দিয়ে উঁচিয়ে, কাঁধ ঝাকিয়ে, রোয়াব নিয়ে দুলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে ফেরে। ছোটরা হাঁ করে দেখে, আর সেই দাদা এক উগ্র আনন্দ অনুভব করে। কয়েকজন যারা এক ক্লাসে নিজের স্মৃতি দু-তিনবার স্বর্ণাক্ষরে লিখতে পেরেছে, তারা নায়কোচিত সেই কর্মকাণ্ডের পর একবার টেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্লকের দোতলাটা চোখ বুলিয়ে ফেলে। আসলে এই ক্রনলজিকাল্ দাদারা নিষ্ঠুর সিলেবাস আর অন্তঃসারশুন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্যাঁচে অ্যাকাডেমিক্যাল্ ভাই হয়ে কেউ নাইনে, কেউ টেন এ ঘষটাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ব্লক্ টায় এগারো-বারোর ক্লাস হয়, আর কি, তাও আবার কো-এড।

এসব রঙ্গই দেখছিল জগাই। মিট্ মিট্ করে হাসছে। "কি বোকা নাহ্?", হাসছে আর ভাবছে। স্যার আসছিলো, জগাই বোঝেনি। ভাবুক মন, কমই বোঝে এসব ভৌত উপস্থিতি। সিঁড়ির দুদিকে লেফট্ আর রাইট্ উইং। দুটো উইং-এই চারটে করে ঘর। স্যার চললেন ধীর পদক্ষেপে। শান্ত শিষ্ট, ক্যালোরি সঞ্চয়ী, ডি-হাইড্রেসানরোধী, টিপিক্যাল্ বীরভূমীয় দ্বিপ্রহরীয় চলন। প্রথম ঘর পুরো ফাঁকা। দ্বিতীয় ঘরে গুটিকয়েক, খাতায় কাটাকুটি খেলছিল। তৃতীয় ঘরের মোটামুটি সামনে দাঁড়িয়ে জগাই।

বীরভূমের ওদিকে অনেক আদিবাসী গ্রাম। ওরা ব্যাঙও খায়। আর ব্যাঙ ধরার আদর্শ সময় হল গিয়ে শীতের শুরু। তখন ব্যাঙ শীতঘুমে থাকে। ঘটনাচক্রে এই শীতঘুম মানে হাইবারনেশানের লক্ষ্য ব্যাঙের ক্যালোরি সঞ্চয়। ক্যালোরি সঞ্চয় সব সময় যে সুখকর তা কিন্তু নয়।

স্যার কথা তেমন বলেননা, পড়ানোর সময়টুকু ছাড়া। পাত্তাও দেন না বিশেষ কাউকে। বরং ঐ শুন্য গোয়ালের পক্ষপাতি। কে ক্লাস করলো কে না, অতো হিসাব রাখেন-না। কিন্তু সেদিন রাখলেন। আসলে নিয়তি যেদিন ডাকবে, সেদিন কোন ভাবেই কাউকে আটকানো যায়না। হঠাৎ কি হল কে জানে, জগাই কে ক্লাসে ডেকে নিয়ে যাওয়াটা দায়িত্ব বলেই মনে করলেন।

ছিপছিপে কঞ্চি, সরু ডগা। ক্লান্ত স্যার, এগারোটা থেকে টানা চার পিরিয়ড এই ক্লাস ঐ ক্লাস ঘুরেছেন। এটা পাঁচ নম্বর। তাই কাজ হবে, অথচ কৃতকার্য কম, মানে ঐ ক্যালোরি কনজারভেশানের রাস্তাটাই নিলেন। বাংলার শিক্ষক হলেও বায়োলজিক্যাল ফিজিক্সের ধারটা অনবদ্য।

জগাইয়ের থেকে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে, হাতের কঞ্চিটা নিয়ে, স্নেহের ছাত্রের কোমরে দিলেন হাল্কা করে খোঁচা। সামনের ডান দিকটায় তখনও ঘোরানো জগাইয়ের ঘাড়, মুখে তখনও চওড়া হাসিটা স্বমহিমায়। পেরিফেরাল ফিল্ড অফ ভিউতে তখনও তাই নবাগত চরিত্র ধরা দেয়নি। ওর কল্পনাজগতের কোন মূর্তিমানকে ঐ স্টিমুলেসানের কারক ভেবে ছেড়ে দিলো। অ্যাপ্লাইয়েড্ ফোর্সের দিকে হাল্কা সরণ হল কোমরটার।

কাজ হলনা।

এবার আরেকটু জোরে। ওদিকেই তখনও তাকিয়ে, ভাবছে। কাতুকুতু ভেবে হাসি মুখটা লিনিয়ারলি চওড়া হল বটে, তবে এখনই ঘুরে দেখাটা প্রয়োজনীয় নয়। কেউ জ্বালিয়েছে। জ্বালিয়ে পালাবে, ও তো হামেশায় জ্বালায়। এর থেকে বরং আরেকটু ভাবুক। ভাবনাতেই ওর আনন্দ। কোমর আবার যথাস্থানে, ডানদিকে ঘোরানো হাসিমুখ নির্লিপ্ত। স্যারও প্রতিক্রিয়াহীনে, বুঝলেন এতে হবেনা। তাড়া আছে। সিলেবাস আছে। ইউনিট টেস্ট আছে। ছ'ফুট লম্বা নিত্যানন্দবাবুর গায়ে জোরও আছে।

অর্থাৎ কিনা ফোর্স বাড়ল স্কোয়ার টার্মে। তবে ঐ যে কঞ্চির ডগা, সরু তো, ক্রস-সেক্সান বলতে পিন-পয়েন্ট। তাই স্ট্রেস বাড়ল এক্সপোনেনসিয়ালি। মানুষের শরীর, তার উপর কোমর। বাল্ক মডিউলাস কতো হয় কে জানে, তবে যাই হবে হোক, হয়েছে বেশ খারাপ। এতক্ষণ ধরে প্রযুক্ত হাল্কা হাল্কা পীড়ন, দুম্ করে বলা নেই, কওয়া নেই, স্থিতিস্থাপক সীমার বাইরে। আমাদের ভাষায় ইলাস্টিক্ ডেথ। সুতো হলে কেটে যেত, তবে মনুষ্যজাতি, অতো সস্তা? জবাব হবেনা? কাতুকুতু হোল অত্যাচার, হাসি হোল রাগ, অ্যাকশান্ হয়েছে, রিঅ্যাকশান্ অবধারিত। হলও তাই। মুখ চললনা। চললে আরও খারাপ হতে পারতো, তবে যাহা চলিল তাহা খারাপতর।

কয়েকদিন আগে বন্ধুদের দেখিয়েছিল ওর সবথেকে প্রিয় রেম্লার, ডব্লিউ ডব্লিউ ই খ্যাত শন মাইকেলস-এর সেই বিখ্যাত মুভ, 'সুইট চিন মিউসিক', মোক্ষম নক আউট কিক্। একদিকে মুখ করে, অন্যদিকে প্রতিপক্ষের থুঁতনিতে বিদ্যুতের গতিতে লাথি। আশঙ্কা সত্যি হল।

ততক্ষণে স্যারের ইস্ত্রি করা কালো প্যান্টে স্নেহের ছাত্রের গুরুদক্ষিণা ছাপ ফেলেছে। জগাই চার ফুট, নিত্যানন্দবাবু ছয়। থুঁতনি পাওয়া গেল না। রিঅ্যাকসান্ ফোর্স অনুভব করেই তো আমরা বুঝি কেমন বসলো। জগাই বুঝল সলিড বসেছে। সবে গোঁফ-দাড়ি গজাতে শুরু করেছে, জগাই এখন নিজের কাছে বেশ বয়স্ক। নাহ্, উচ্ছ্বাস বের হতে দিলে হবেনা। প্রতিপক্ষ যে নাস্তানাবুদ তা বুঝেছে সে, মুখটা ঘুরিয়ে দেখলোওনা। লঘু বিরোধীকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাবে। কাঁধ হাল্কা ঝাঁকিয়ে, বুকটা ফুলিয়ে, নিঃশব্দে 'কেমন দিলাম, বোঝ্ এবার' ভাব।

পঞ্চাশ বছরের প্রবীণ শিক্ষকের তিরিশ বছরের শিক্ষক জীবন। বহু ইঁচোড়ে-পাকাকে রাস্তায় এনেছেন। যার চোখে কেউ চোখ রেখে কথা বলার সাহস করেনি, সে আজ হতভম্ব কয়েকটা সেকেন্ড। মুখ রাগে লাল। ঝুল্পির পাশ দিয়ে গাল বেয়ে গড়াতে থাকা ঘাম সূর্যের আলোয় রুপোর মত চক্-চক্ করছে। কেমন একটা অস্থির। অনুভুতিটা হেরে যাওয়ার না ঘেন্নার না রাগের নাকি আশ্চর্যের বোঝা কঠিন। অতো কম সময়ে অতো অনুভুতি আসেওনা বোধ হয়। ছেলেটা তখনও অন্যদিকে তাকিয়ে হেলান দিয়ে হাসছে। কদিন আগে ওদেরকেই স্যার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গল্প শুনিয়েছিল, 'মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবনা?'। যাই হোক কলসির কানা তাও হয়তো মানা যায়, তাই বলে পা? নাহ্, শিক্ষক নিত্যানন্দবাবু, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ হতে পারলেননা, অর্থাৎ কিনা মূর্খ ভক্ত আর বিরাট ভগবানের মধ্যে প্রেম

চালাচালি হলনা। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। চালাচালি নয়, এবার এক-মুখি প্রবাহ, শক্তির প্রবাহ। ঐ জগাই বেঁচেছিল, এই জগাইয়ের সেই ভাগ্য হলনা। নিজেকে সামলালেন নিত্যানন্দবাবু। কোমরের ইঞ্চি ছয়েক নিচে হবে, সেই বীভৎস কঞ্চি মনে হয় শব্দের থেকে বেশিই গতিতে গেল, সাঁ করে একটা শব্দ হয়েছিল বটে। সম্বিত ফিরে এলো ছাত্রের। ঘুরে দাঁড়িয়ে, চিন্-চিন্ করে জ্বলা জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আরও কয়েকটা সেকেন্ড। ছেলে বোঝেনা দোষ কি, স্যার দ্বিতীয়বার ভাবতেও চান না কি দোষ ছিল। জ্বালিয়ে দেওয়া থার্মোডিনামিক প্যারামিটারে জ্বালিয়ে দেওয়া এই মেকানিক্যাল কোয়ানটিটি। এক বাড়িতেই ততক্ষণে ঠাণ্ডা জগাই। স্যার সামনে না থাকলে দু'মিনিট দৌড়ে বেড়াই, তাতে যদি জ্বালা কমে। গুরু দ্রোণকে অর্জুন তাজ্জব লাগিয়ে দিয়েছিল, শব্দভেদি বাণ মেরে দেখিয়ে। কিছুক্ষণ পর স্যারের প্যান্টের পা-এ তার চোখে পড়ল, তারই পদধূলিধন্য শিল্পকলার স্মারক। অর্থাৎ তার ঐ অনুভুতিভেদি পদ-সঞ্চালনের স্থান ও পাত্র যে বেশ বেমানান, ছেলে বুঝেছে। মাথা নামিয়ে লজ্জায়, ভয়ে চুপচাপ ঘরে ঢুকল জগাই। কৃতকর্মে অনুতপ্ত।

স্যার তখনও ঘামছে দরদরিয়ে। মুখটা তখনও লাল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। .....।।

প্রত্যক্ষদর্শী বলতে একজনই। ঘটনার আদ্যপ্রান্ত দেখছিল সেই মহাপুরুষ। ঐ বয়সে মজা দেখার একটা আলাদায় নেশা থাকে। ওউ বন্ধুকে ডাকেনি, মজা দেখবে বলে। মজা ঐ পর্যায়ে যাবে জানলে হয়তো ডাকত। ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসছিল, স্যার ঢোকার আগে পর্যন্ত। আন-প্রেডিক্টেবেল। কি দেখল চোখটাকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। ক'দিন আগে আধুনিক কবিতা পড়েছে, মনে পড়ল, "এক এক মিনিট মম, লাগিছে ঘণ্টা সম, প্রভু চাপিবারে দাও শক্তি'। হাসি আটকাতে হবে। আটকাচ্ছেনা।
স্যার ঢুকলেন এক-দুই মিনিট পর।

"তুই সব দেখলি?", ক্লাসে ঢুকে প্রথম প্রশ্ন নিত্যানন্দবাবুর?

গলা শুকিয়ে কাঠ। ভয়ে কর্পূরের মত উড়ে গেল হাসি। নিজের পক্ষের যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ তৈরি করে শুরু করতে যাবে জবাব, আরেকবার তখনই কঞ্চিটা উঠল। এবার জগাই না ওর কপালে নাচছে কে জানে।

"আমাকে তুমি বন্ধু পেয়েছ?", রাগী গম্ভীর গলায় কথাটা শেষ না করেই নিত্যানন্দবাবু হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

"ছিঃ জগা, তুই আমাকে .....", আবার হো হো করে হাসছেন স্যার। জগাইও হাসছে স্যারের সাথে। আর সেই মূর্তিমান হাসতে হাসতে একটা পা ই তুলে ফেলেছে হাইবেঞ্চে।

ক্যাটেগরি -১,২,৩-এর শিক্ষক তখন ওভারল্যাপ করেছে।

নাহ্, ওনাদের ক্যাটেগরাইজ করা যায়না।

রহস্যময় লোকটা তখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল।

রহস্যময় লোকটা বন্ধুর মত পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

প্রচণ্ড গরম। তখনও টিফিন চলছে।

বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞান, অন্ধকার থেকে আলো

– সুজয় কুমার মণ্ডল*, প্রাক্তন অতিথি শিক্ষক

মানুষ যুক্তিশীল জীব। বাস্তব জীবনের সমস্ত ঘটনা ও বিষয়কেই সে কোনো না কোনো কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়। এই কার্য আর কারণের সম্পর্কের নাম যুক্তি। তবে যে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের পেছনে আমরা যে কারণ চিহ্নিত করে থাকি, তা সবসময় সত্য বা যথাযথ নাও হতে পারে। যেমন একটি শিশু জন্মের পরই তার দুটো চোখের দৃষ্টি হারালো, এই ঘটনার কারণ হিসেবে অনেক সময়ই আমরা তার পূর্বজন্মের করা কোনো পাপকে চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে শিশুটির দৃষ্টিহীন হওয়ার কারণ কোনো অসুখ কিংবা দুর্ঘটনা। অর্থাৎ, আমরা ঘটনার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অনেক সময়ই ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বিষয়কে কারণ হিসেবে তুলে ধরি। এই ধরণের সম্পর্কহীন ও অবাস্তব কারণ নির্দেশ করাকেই সাধারণভাবে কুসংস্কার বলা হয়।

মানুষের ইহ জাগতিক জীবনের সমস্ত ঘটনার পেছনে রয়েছে তার ইহ জীবনের নানান বাস্তব কারণ। যেমন ক্লাসে ফেল করার পেছনে রয়েছে পড়াশোনা না করা, ঠিক করে খাতা না দেখা কিংবা এরকমই কোনো বাস্তব কারণ। কিন্তু মানুষের মন এই ধরণের সাদামাটা কারণে নিজের অসামান্য ক্ষতি কিংবা অন্যের জব্দ হওয়ার বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করে খুব একটা আরাম বোধ করেনা। তার চাই কোনো অসামান্য, কিংবা অভাবনীয় কারণ, যা তাকে কিংবা ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে চমকে দেবে। এমনকি নুনের ছিটে দিতে পারে তার কাটা ঘায়ে। তাই, বর্তমানের দুঃখ ভোগের কারণ হিসেবে পূর্বজন্মের কোনো পাপের উল্লেখ করলে ভুক্তভোগীর একটা মানসিক সান্ত্বনা হয় এটা ভেবে যে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তার কিছুই করার নেই, কিংবা নিজের কোনো ভুলকে স্বীকার করার ঝামেলাতে না গিয়ে বর্তমান ঘটনার জন্য নিজের সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলার একটা সহজ সুযোগ হল এই পূর্বজন্ম বা "জন্মান্তরবাদ"। অনেক ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা পীড়িত মানুষকে তার তুচ্ছ সমস্যার জন্য বড় ধরণের অপরাধী বলে চিন্হিত করার জন্য অন্যেরা তার সমস্যার কারণ হিসেবে পূর্বজন্মের কোনো অজানা বৃহত্তর পাপকে উল্লেখ করে মজা পায়। আবার কেউ কেউ এই ধরণের পাপ থেকে মুক্তির ভ্রান্ত ধারণা যেমন যজ্ঞ, পূজাপাট, তাবিজ, মাদুলি ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করে।

সুতরাং দায় ঝেড়ে ফেলা, মানসিক আরামবোধ, অন্যকে জব্দ করা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা ইত্যাদির মতো কারণ থেকেই জন্ম নিয়েছে "জন্মান্তরবাদ"-এর মতো বৃহত্তর সামাজিক কুসংস্কার। কিন্তু এই সমস্ত ধারণা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থেকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বীকৃতি পেয়ে ক্রমশ একটা প্রশ্নাতীত সামাজিক বিশ্বাসের রূপ নেয়। তখন আর তাকে প্রশ্ন করা যায় না, প্রশ্ন করার মানে হয় ধর্ম বা সমাজের বিরোধিতা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, শুধু এই রকমের বৃহত্তর সামাজিক বিশ্বাসই নয় 'হাঁচি', 'টিকটিকি', 'পিছুডাক' ইত্যাদি অজস্র ছোটোখাটো অযৌক্তিক বিশ্বাস আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সব বিশ্বাসেরও জন্ম হয়েছে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে এবং দীর্ঘ অভ্যাসে তা বিশেষ বিশেষ সমাজে স্থায়ী বিশ্বাস হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

যেকোনো কারণেই কোনো ঘটনা কিংবা বিষয়ের কার্য-কারণের যুক্তিকে বিকৃত করলে আমরা যুক্তি এবং সত্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকি, যা আমাদের সামাজিক অগ্রগতিকে ক্রমশ পেছনের দিকে নিয়ে যায়। যেমন শিশুর অসুখ হওয়ার কারণ হিসেবে আমরা যদি ডাইনি কিংবা ভূতের প্রভাবকে দায়ী করি, তাহলে আমরা শিশুটির জীবন এবং যাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করা হয়েছে, তার জীবন বিপন্ন করব, তেমনই সামাজিকভাবে ভবিষ্যতের অনেক অনাগত শিশু ও ডাইনি সন্দেহের ব্যক্তিদের জীবনকেও স্থায়ীভাবে বিপন্ন করে যাব। তাই যেকোনো বাস্তব ঘটনার কারণ নির্দেশের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আশ্রয় নিতে হবে একদম বাস্তব কারণের, বুঝতে হবে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মকে এবং আসতে হবে একটা বাস্তব সিদ্ধান্তে। এইভাবেই আমরা কুসংস্কার থেকে বিজ্ঞানের পথে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে, মিথ্যা থেকে সত্যের পথে, এগিয়ে যেতে পারব। এই পথেই সমাজ ও সভ্যতার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

* বর্তমানে লেখক রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো।

শব্দ-জব্দ

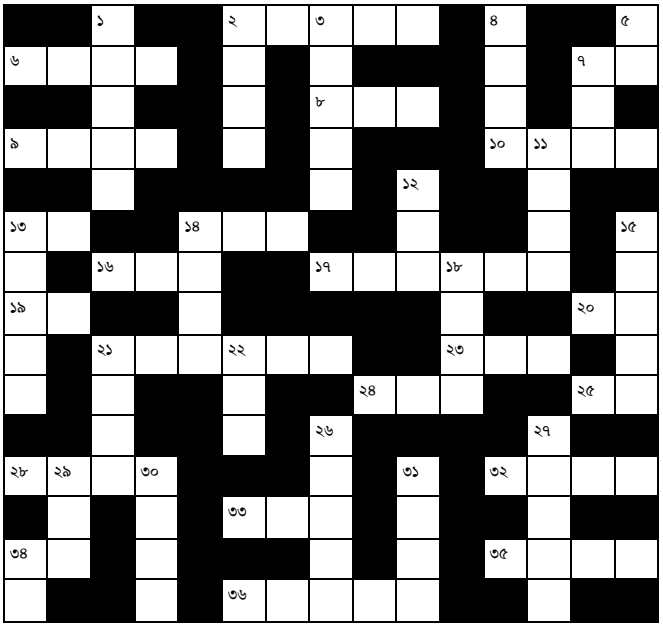

উপর-নীচ –

১) দূর হতে বার্তা আনে, নাম তার দূরভাষ/ আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী, সাবাস তুমি জিনিয়াস। ২) এইদিকে বৃষ্টি পড়ে, ঐদিকে রবি/ মিলেমিশে হয়ে যায় সাতরঙা ছবি। ৩) বর্তনীতে সহজ পথ, জুড়ে গেলে মহাবিপদ। ৪) কাঁচের ঘরে ছোট্ট তার, করল দূর অন্ধকার/ আবিষ্কারক আমেরিকান, উল্টে লেখ তাঁরই নাম। ৫) ধরাধামে কারবার, মহাকাশ চিনবার/ ইংরাজিতে চারটি letter, লিখলে পাবে নামটি তার/ শেষ থেকে শুরু করো, দুটি ঘর পূরণ করো। ৭) মানবীর নামে এক, অমানুষী নাগরিক/ মগজ আছে, নাইকো হিয়া, নাম তার ------। ১১) খ্যাতি তাঁর জগৎজোড়া, লিখেছেন প্রিন্সিপিয়া। ১২) ইসরোর mission, রকেট পাঠায় দূর গগনে/ এই ভারতের এখান থেকে, রকেট ছোটে আকাশপানে। ১৩) সূর্য থেকে আসা আলো, আয়না দিয়ে ধরে/ ফেললো দূরে মাঝ সমুদ্রে, শত্রু জাহাজ পরে/ তীব্র আলোর ঝলকানিতে, জাহাজ গেল পুড়ে/ কোন বিজ্ঞানীর কারসাজি এ, বলো বুদ্ধি করে। ১৪) বিশেষ মৌল, বিশেষ ধর্ম/ ধর্ম আছে যতক্ষণ, বিকিরণ ততক্ষণ। ১৫) আলোকরশ্মির বিক্ষেপণ, এই তাঁর ধ্যান জ্ঞান/ তত্ত্ব আছে, প্রমাণ আছে, তাইতো নোবেল তাঁর কাছে/ ভারতবর্ষে জন্ম যাঁর, ভারতরত্ন ভূষণ তাঁর। ১৮) নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম তো তিনি। ২১) কঠিন বস্তুর ধর্ম, অনুপাতে মাপ। ২২) বয়ে যায় ঢাল বেয়ে, তরলের ধর্ম যা/ বিজ্ঞানের ভাষা জেনে, একে বলি ____। ২৬) দুষ্প্রাপ্য এই মৌলখানি, নামে আছে জন্মভূমি। ২৭) জটিল তত্ত্বের মূলকথা, চারিখান সূত্রে গাঁথা/ কার নামে সূত্র বলো, পাঁচটি ফাঁকে লিখে ফেল। ২৯) সাজিয়ে নিয়ে লিখতে হবে, নকল করা সহজ হবে। ৩০) লবণ নামে আছে ঘরে, অপর নামে খনি গহ্বরে। ৩১) ছোট্ট একটি বোর্ডে গড়া, সস্তা কম্পিউটার/ 'পাই' জুড়ে খুঁজলে পাবে, নামজাদা কারিগর। ৩৪) মধ্যিখানে অবস্থান, বৃত্তমাঝে খুঁজে আন।

পাশাপাশি –

২) মহাকাশে বিচরণ, এ ভারতে তিনিই প্রথম। ৬) নিউক্লিয়ার ফিশন, এতো তাঁর অবদান/ তবে তিনি একা নন, সাথে আরো কয়জন। ৭) প্রতীক চিহ্নে লাতিন নাম, উজ্জ্বল ধাতু মূল্যবান। ৮) এও এক অনুপাত, ত্রিভুজের ধারাপাত। ৯) বাজবে মাইক, ফাটবে বাজি/ জোর কত তার, কিসে মাপি? ১০) বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার, বল দেখি নাম তার। ১৩) ভর মাপি গ্রামে, কাজ মাপি কিসে? ১৪) মৌলিক পদার্থ, জল করে দূষিত/ আণবিক সংখ্যা তার, ছক পূরণে দরকার। ১৬) তরল মানেই এক নয়, গাঢ়ত্ব ভিন্ন হয়/ কম বেশী ভিন্ন মাপ, প্রকাশ করে এই একক। ১৭) পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা, নোবেল পেলেন দুইখানা। ১৯) 'ওয়ে' জুড়ে এর সাথে, পথ মেলে অন্তহীন/ ছড়িয়ে আছে মহাকাশে, চক্রাকারে রাত্রিদিন। ২০) চাপের মাপ শিখিয়ে দিলেন, এককটিতে নামটি পেলেন। ২১) দেড়শ বছর আগে প্রকাশ, এমন অবাক ছক/ সেই স্মরণে এই বছরে, বিশ্বজুড়ে ডাক। ২৩) ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক বর্তনীতে কার্যকরী উদ্ভাবন, আবিষ্কর্তার নাম নিয়ে, হয়ে যাবে ছকপূরণ। ২৪) বাঙালী এক বিজ্ঞানী, তাঁর নামেতে কণাখানি। ২৫) সুপরিচিত ধাতব মৌল, উজ্জ্বলতায় রজত তুল্য। ২৮) লজিক্যাল সমতা সনাক্তকারী, বলো দেখি নাম তারি। ৩২) এই সেই আবিষ্কার, নোবেল তার পুরস্কার, পদার্থবিদ্যায় প্রথমবার। ৩৩) ছবির উপর পড়ে ছবি, হয়ে যায় চলচ্ছবি/ আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী, নাম তাঁর জানি জানি। ৩৪) Memory-র কাজ করে, ইলেকট্রিক বর্তনীতে/ উল্টে দেখো চেনো কিনা, দু' letter-এর শব্দটিকে। ৩৫) বিজ্ঞানীর পদবী আছে, চৌম্বক ধর্মের কোনো এক একক মাঝে। ৩৬) অসামান্যা পারদর্শিনী, দুই বিদ্যায় নোবেল বিজয়িনী।

বিমল

– তরুণ কুমার তপাদার, প্রাক্তন অধ্যাপক

বিমলের ডাকনাম কি করে 'বেল' হ'ল জানা নেই। পরিচিত দু'একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারাও সঠিক করে কিছু বলতে পারেনি। মনে হয় ওর বাবা অথবা মা মারা যাবার পর মাথা ন্যাড়া করার সময় থেকে বন্ধুরা মজা করে এই নামে ডেকে থাকবে। এলাকায় 'বেল' নামেই সে পরিচিত। বিমল নামটা এখন অনেকেই ভুলে গেছে। বিমলকে প্রথম যখন দেখি তখন সে বছর তিরিশের যুবক। সুন্দর সুঠাম চেহারা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। দিনের বেলা সে রিকশা চালায়, আর বিকেলে সবজি বিক্রি করে। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় রিকশা নিয়ে ও যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করত। অন্য রিকশাও এখানে এসে দাঁড়াত যাত্রীর আশায়। এভাবেই এক সময় এই জায়গাটা 'রিকশা স্ট্যান্ড' হয়ে গেল। এদের মধ্যে অনেকেই এলাকার ছেলে। বয়সে ওরা আমার চেয়ে অনেক ছোট বলে আমি ওদের নাম ধরেই ডাকতাম। কারো সাথে কয়েক দিন দেখা না হলে জিজ্ঞেস করতাম সে আসছে না কেন। এভাবেই একদিন বিমলের খোঁজ নিতে জানতে পারলাম সে 'তারাপীঠ' গেছে। ও নাকি মাঝেমধ্যে 'তারাপীঠ' যায়। একবার বেশ কয়েকদিন 'বেল'কে দেখতে পাইনি। পরে শুনলাম সে নাকি 'কামাখ্যা' দর্শনের উদ্দেশে আসাম পাড়ি দিয়েছে। পরে জেনেছিলাম বিভিন্ন মন্দিরে ঘোরা ওর এক রকমের শখ। তেঘরিয়ায় বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দিরে অথবা দেওঘরে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে বছরে অন্তত একবার সে যাবেই, বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলিতে। একবার দু'তিন দিন ওকে স্ট্যান্ডে গাড়ি লাগাতে দেখিনি, পরে দেখা হওয়াতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বিমল, দু'দিন তোমায় দেখলাম না।' একটু ইতস্তত করে ও বলল, 'তারাপীঠ গিয়েছিলাম, পুজো দিতে।' কিছুদিন আগেই ও তারাপীঠ ঘুরে এসেছে জানতাম। আমি কিছু বলার আগেই সে যা বলল সেটা অবাক করার মত। কিছুটা অসন্তোষের সঙ্গে সে জানালো গত বছরও এই সময় ছেলের পরীক্ষার আগে সে তারাপীঠে গিয়ে মায়ের পুজো দিয়েছিল, কিন্তু ছেলে পরীক্ষায় পাশ করেনি। এবার পুজো দিয়ে 'মা'-কে বলে এসেছে যদি এবছর ছেলে পাশ না করে তবে আর কোনদিন তারাপীঠে এসে মায়ের পুজো দেবে না। বুঝতে পারলাম প্রতি বছর পুজো দেওয়ার পরও এরকম ফলে সে খুবই হতাশ হয়েছে। এই নিয়ে আর কোন কথা হয়নি সেদিন। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। প্রায় বছর খানেক বাদে একদিন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় বিমল এল রিকশা নিয়ে। ওখানে তিনটে রিকশা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে একজন বলল, 'কিরে বেল, এবার কি একা গেছিস? নাকি বাড়ির সবাইকে নিয়ে?' ওদের কথায় বুঝতে পারলাম বিমল গতকালই ফিরেছে তারাপীঠ থেকে। আমার মনে পড়ে গেল ওর ছেলের এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার কথা। জিজ্ঞেস করাতে বলল যে গত বছর পাশ করেনি, তাই ক্লাস নাইনে পড়ছে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওকে কি বলব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ এক বছর আগের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এরপরও তুমি তারাপীঠ ঘুরে এলে? গত বছর তো তুমি মায়ের কাছে বলে এসেছিলে, ছেলে ভালভাবে পাশ না করলে পুজো দিতে আর তারাপীঠ যাবে না?' বিমল একটু মুচকি হেসে বলল, 'আমি এসব বলেছি! আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।' আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও আরো বলল, 'পুজো বন্ধ করা যায় না।

মার কাছে চাইলে তবেই কিছু পাওয়া যায়।' বুঝলাম সেদিনের কথা ওর ভালই মনে আছে। মোহ আর বিশ্বাস এদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে এর থেকে বেরিয়ে আসবার কথা এরা ভাবতে পারে না। বিমলের যিনি ধর্মগুরু তিনি অনেকদিন হ'ল দেহ রেখেছেন। 'বেল' তাঁরই কোন শিষ্যের কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। বছরে অন্তত একবার সে গুরুদেবের আশ্রমে উৎসবে যোগ দিতে যায়। গুরুভাইদের একটা নিয়ম মেনে চলতে হয়। শুক্রবার দিন মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না, ঐ দিন নিরামিষ আহার করতে হবে। বিমল নিজেও একথা আমায় অনেকবার বলেছে। কোন এক শনিবার বিমলের সঙ্গে দেখা। এ সময়টা যাত্রী সংখ্যা একটু কমই থাকে। আমাকে দেখে বিমল রিকশা থেকে নেমে এল। এসে বলল, কাল এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ ছিল ওর, খুব ভাল খাইয়েছে। দু'রকমের মাছ, ফ্রায়েড রাইস, দই, মিষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। বিমল জানালো এখন সকলে 'মৎসমুখি'-তে নিমন্ত্রণ করে, নিরামিষ হলে লোকজন তেমন হয় না। এরই মধ্যে বিমলের কয়েকজন গুরুভাই এসে পড়েছে। এরা সবাই রিকশা চালায়। হঠাৎ আমার মনে পড়ল গতকাল ছিল শুক্রবার, ঐ দিন তো ওদের মাছ-মাংস খাওয়া বারণ। তাহলে বিমল মাছ খেল কি করে? ওকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, এরকম কোন নিয়ম নাকি নেই। ওর গুরুভাইরা সকলেই বলল, নিয়ম আছে। আর ওরা সকলে তা মেনেও চলে। বিমল ওদের কথার প্রতিবাদ করল না, শুধু বলল ওর দীক্ষাগুরু নাকি বলেছে ইচ্ছে হলে মাছ-মাংস খেতে, ইচ্ছে নাহলে খাবে না। বলা বাহুল্য কেউ ওর কথা বিশ্বাস করল না, ওকে মিথ্যে-বাদী, লোভী বলে গালমন্দ করতে লাগল। বিমল রাগ করল না। হাসিমুখে ওদের অভিযোগগুলো শুনে গেল। ওকে দেখে মনে হ'ল ওরা মিথ্যে বলেনি। এমন সময় কয়েকজন যাত্রী এসে যাওয়াতে সবাই চলে গেল। একদিন দুপুরে বিমল এসে একটা ক্লাবের নাম করে বলল ওরা রবিবার একটা রক্তদানের অনুষ্ঠান করছে। ওর যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু যেয়ে লাভ হবে না। একবার রক্ত দিলে তিন মাসের মধ্যে আর রক্ত দেওয়া যায় না। এসব কথা হচ্ছে এমন সময় একটা রিকশা এসে দাঁড়ালো সেখানে। চালক গাড়ি থেকে নামল না। ছেলেটিকে আগে এখানে দেখিনি, কিন্তু বিমলকে ও ভালই চেনে। রক্তদানের কথা শুনে ছেলেটি বলল, 'জানেন তো রক্তদান করে বেল ঘর ভরছে। মোবাইল, চেয়ার, ঘড়ি, ব্যাগ ঘরে ঢুকিয়েছে। যেখানে ভাল উপহার পাবে, বেল সেখানে রক্ত দিতে যাবে।' বিমল ওর কথায় রাগ করল না। আমি অবাক হয়ে বেলের দিকে চেয়ে দেখলাম ওর মুখে মুচকি হাসি। এরপর ছেলেটি আর দাঁড়ায়নি। বিমলকে এভাবে হাসতে দেখে আমার একটু রাগ হ'ল। এমন সময় একজন যাত্রী এসে যাওয়ায় ওকে আর কিছু বলা হ'ল না। পরের দিন দুপুরে ওর সাথে আবার দেখা হয়েছে। ওকে বললাম, 'কাল ছেলেটা তোমায় যাতা বলে গেল আর তুমি চুপ করে রইলে, কিছু বললে না!' বিমল শান্তভাবেই উত্তর দিল, 'কি আর বলব! এমনিতে কেউ রক্ত দেয় না। কিছু না পেলে রক্ত দেব কেন?' একথা শোনার পর আমি আর দাঁড়াইনি। বিমলের সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। ওর চাল-চলন আগের মতোই আছে। শুধু লকেট লাগানো একটা মোটা চেন এখন গলায় পরছে। লকেটটাতে ওর গুরুদেবের একটা ছবি আছে দেখেছি। এতদিনে ওর ছেলে হয়তো ক্লাস টেনে উঠে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি অবশ্য ওকে একথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাইনি।

Estimation: A Precursor to Measurement

– Bhupati Chakrabarti, Ex. Professor

In a way the act of estimation is an everyday activity. We look at the both ends of the road while crossing a road and make a judgement whether or not to cross the road. And this judgement depends on an estimation of a number of things like the width of the road or the rate of traffic flow and of course the concerned person's agility. Occasional crossing of national highways involve different skill of estimation keeping in mind that the vehicles on the road are moving at a much higher speed. We estimate the time to reach from one point to another, we make an estimation of food items we should order in a restaurant looking not only at the number of friends we are having with but also at the level of their hunger. In fact estimation is an everyday activity and we possibly do it even without being conscious about it. And for the various spheres of our life we are expected to develop the habit of estimation even before we have reached our teenage. The amount of sugar one would get for half a kg of sugar and its difference in the volume of say 100 gram of dried chilli is expected to be a common knowledge that one should develop.

The young students entering the UG classes in a college normally know these things but the units prove to be quite disturbing. First the students tend to assert their heights in feet and inches but the weight comes in kg. Area of the apartment comes in square feet but the distance of the building from the nearest important crossing is quoted in km. So we get two separate information with units from two different systems. This may be a bit uncomfortable yet are correct and acceptable. But the things are made worse when one refers to his height as five seven and weight as 57. A little probe reveals that he is a bit unsure of the units and have possibly deliberately did not mention them. Estimation demands not only the ability of anticipation but the knowledge of units as well. A good number of students cannot come up with a reasonable estimation of say, length of a table in the laboratory or the pen he is using or the mass of the exercise book he is carrying. In fact a section of them come up with a number without a unit. Sometimes the number is fair enough if he/she is ready to put the metre or may be cm as the unit in the case of a length but once you ask some of them begin to fumble. This was my experience with some students and definitely not with all when I was teaching in the physics department of City College. However I am not sure if the students are now taking the help of omnipresent 'Google Sir' for this and are coming up with quite reasonable estimation.

Google Sir or not let me assure the students that they are not the only culprits. What I essentially want to stress is that we should try to make the estimation wherever necessary or whenever there is a scope for because sometimes this becomes the only way to get meaningful information. We have to remember that we cannot measure anything and everything but the estimation can help us in this regard.

Suppose you are asked to estimate (remember you cannot be asked to find out) the number of oxygen molecules in your classroom you know you will only get an order of magnitude result. It is not possible for anyone to sit down and count the number of molecules but one can really have a fair estimation even without any measuring device. Let me tell you how this can be done. Let us make a guess of the approximate dimensions of the classrooms. If you are doing it with your classmates we can have a few numbers and possibly you will be able to converge to a number. For example if you guess the length of the room to be 8 metre some may come up with a proposal of 6 m while some

may argue in favour of 7m and your classmates may ultimately accept 7.5 m as the length and I can assure you that is going to be a fair estimation. Then estimate the two other dimensions of the room in the similar way. Get the volume of the air in the room. You may leave aside 5 to 10% of this volume keeping in mind that the room has furniture, students sitting over there and some volume of air has been expelled out. Now the density of air (1.29 kg m^{-3} at 0^0 C and may be taken as 1.25 kg m^{-3} at room temperature for easy multiplication). Use the vapour density of air to get the effective molecular weight of this mixture of gases and you can reach your answer by using the Avogadro number. I can assure you the order of magnitude will emerge even if you have not taken any measuring device. And you would realize that the units are important and you have to be careful about this.

Finally let me tell you the link between the estimation and units through a story that is included in the collection of stories involving Emperor Akbar and his famous court member Birbal. Once the Emperor Akbar and his court members went to a lakeside for relaxation. While taking an afternoon stroll by the side of the lake the Emperor possibly wanted to test the ready wit of Birbal once more and asked him "The lake is really very large, isn't it?"

"Yes my Lord," came the reply from Birbal.

"Well" said the Emperor, "Birbal if you can tell me how many cups of water are there in this lake you will have a nice reward".

Hope all of us would appreciate that it is indeed a daunting task.

But Birbal really didn't take much time. He said "My Lord, if the size of the cup is equal to that of the lake then there is one cup of water, if the cup is half the size of the lake then there are two cups of water. However if the cup is one quarter of the size of the lake then it has four cups of water and...."

Emperor stopped him. He knew that we cannot have a cup that has a size even one thousandth part of the water content in a big lake. He could realize that since a cup does not represent a unique volume Birbal had been able to identify the tricky route to estimation. And that tells us why the units are important.

শব্দ-জব্দের উত্তরমালাঃ-

উপর নীচ-

১) গ্রাহাম বেল, ২) রামধনু, ৩) শর্টসার্কিট, ৪) এডিসন, ৫) নাসা, ৭) সোফিয়া, ১১) নিউটন, ১২) থুমবা, ১৩) আর্কিমিডিস, ১৪) তেজস্ক্রিয়, ১৫) সি ভি রমন, ১৮) রন্টজেন, ২১) পয়সন, ২২) সান্দ্রতা, ২৬) পোলোনিয়াম, ২৭) ম্যাক্সওয়েল, ২৯) জেরক্স, ৩০) রকসল্ট, ৩১) রাস্পবেরী, ৩৪) কেন্দ্র।

পাশাপাশি-

২) রাকেশশর্মা, ৬) অটোহান, ৭) সোনা, ৮) সাইন, ৯) ডেসিবেল, ১০) এনিয়াক, ১৩) আর্গ, ১৪) তেত্রিশ, ১৬) পয়জ, ১৭) জন বারডীন, ১৯) মিল্কি, ২০) টর, ২১) পর্যায়সারণী, ২৩) জেনার, ২৪) বোসন, ২৫) টিন, ২৮) এক্সনর, ৩২) এক্সরশ্মি, ৩৩) মার্কনি, ৩৪) জেকে, ৩৫) ওয়েবার, ৩৬) মাদাম কুরী।

Dirac's monopole: Semi-classical treatment by M. N. Saha

– Amiya Bhushan Biswas, Ex. Professor

P. A. M Dirac presented[1] for the first time (1931) an intriguing suggestion (which we will examine below) for the appearance of magnetic charge or monopole in the early development of quantum electrodynamics. Since then the search for monopole is renewed whenever a new domain of energy is available in the field of high energy physics. Inspite of continuing and extensive searches no positive evidence for the existence of magnetic charges has been observed. However, it turns out that there are some expectations from quantum field theory [QFD] say, super-string theory that magnetic charge may exist.

The material that I am going to present here is freely borrowed from the section 6.11 and 6.12 of Jackson's classical electrodynamics (Third edition)[2]. Following Dirac here I give some outline of how the concept of magnetic charge would affect the classical electrodynamics and then consider the semi-classical means due to M. N. Saha[3] that leads us to illuminate the Dirac's charge quantization condition.

■ Dual Transformation

We first consider some necessary preliminaries. Within the framework of classical electrodynamics [in CGS Gaussian system of units] the Maxwell's equations [with widely accepte symbols for electric and magnetic fields ($\vec{E}$ and $\vec{B}$) and, electric charge- and current-densities (ρ and $\vec{j}$)] read

$$\begin{aligned}
&\vec{\nabla}.\vec{E} = 4\pi\rho \\
&\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\
&\vec{\nabla}.\vec{B} = 0 \\
&\vec{\nabla}\times\vec{B} = \frac{4\pi}{c}\vec{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}
\end{aligned} \qquad \ldots(1)$$

One must note that there is asymmetry in these equations in that there are electric charge- and current-densities but the corresponding magnetic densities are absent. Let us assume that there exist, in addition to electric densities, the magnetic charge- and current-densities. The Maxwell's equations would then become

$$\begin{aligned}
&\vec{\nabla}.\vec{E} = 4\pi\rho_e \\
&\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{4\pi}{c}\vec{j}_m - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\
&\vec{\nabla}.\vec{B} = 4\pi\rho_m \\
&\vec{\nabla}\times\vec{B} = \frac{4\pi}{c}\vec{j}_e + \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}
\end{aligned} \qquad \ldots(2)$$

where I have used subscripts '*e*' and '*m*' to distinguish the electric and magnetic densities. The equations for $\vec{E}$ and $\vec{B}$ are now similar. This similarity can be utilized to introduce the duality transformations

$$\vec{E}' = \vec{E}\cos\xi + \vec{B}\sin\xi$$
$$\vec{B}' = -\vec{E}\sin\xi + \vec{B}\cos\xi \quad ...(3)$$

where ξ is an arbitrary parameter, may be called 'angle' (not a physical angle). If now one assumes similar transformation for the source densities,

$$\rho_e' = \rho_e\cos\xi + \rho_m\sin\xi$$
$$\rho_m' = -\rho_e\sin\xi + \rho_m\cos\xi \quad ...(4a)$$

and,

$$\vec{j}_e' = \vec{j}_e\cos\xi + \vec{j}_m\sin\xi$$
$$\vec{j}_m' = -\vec{j}_e\sin\xi + \vec{j}_m\cos\xi \quad ...(4b)$$

It becomes a straightforward algebra to show that the generalised Maxwell's equations (2) with magnetic densities ρ_m and $\vec{j}_m$ remain invariant under these duality transformations. If $\xi = 90^0$, the electric and magnetic fields as well as densities are just interchanged:

$$\vec{E}' = \vec{B};\ \vec{B}' = -\vec{E}$$
$$\rho_e' = \rho_m;\ \rho_m' = -\rho_e$$
$$\vec{j}_e' = \vec{j}_m;\ \vec{j}_m' = -\vec{j}_e;\ (if\ \xi = 90^0) \quad ...(5)$$

The invariance of the generalised equations of electrodynamics under duality-transformations shows that it is a matter of convention to speak of a particle possessing an electric charge, but not magnetic charge. One interesting possibility is that all elementary particles have same ratio of (their own) magnetic charge (q_m) to electric charge (q_e).

$$R_{me} = \frac{q_m}{q_e} = const \quad ...(6)$$

Then an 'angle' ξ can be found for which $\rho_m' = 0$. Such a case of magnetic charge would be transformed away, giving the world as we see today with no observed magnetic charge or magnetic monopole.

■ **Dirac's charge quantisation condition:**

Semi-classical derivation by M. N. Saha

Dirac showed in 1931[1] that, anywhere in the universe, the existence of even one magnetic charge would require that electric charge be quantised in a consistent quantum mechanical theory. The observed quantisation of electric charge (q_e) in integral-multiple of electronic charge (e) has been an attractive argument for the actual existence of magnetic charge (q_m) in unit of monopole charge say, g. By considering quantum mechanics of an electron in presence of a magnetic monopole of charge g, Dirac showed the charge quantization condition,

$$\frac{eg}{c} = n\frac{\hbar}{2};\ n = \pm 1, \pm 2, \cdots \qquad \ldots(7)$$

Our aim is now to rederive this condition semi-classically following M. N. Saha[3].

We consider the case of a single point magnetic charge (i.e. a monopole) g at a distance $\vec{d}$ from a point electric charge e as shown in Fig.1. There is an electric field at the field point,

$$\vec{E} = \frac{e}{r^3}\vec{r} \qquad \ldots(8)$$

and magnetic field,

$$\vec{B} = \frac{g(\vec{r} - \vec{d})}{|\vec{r} - \vec{d}|^3} \qquad \ldots(9)$$

The total electromagnetic field angular momentum $\vec{L}_{em}$ is given by the volume integral of $\vec{r} \times \vec{\mathrm{P}}_F$ where

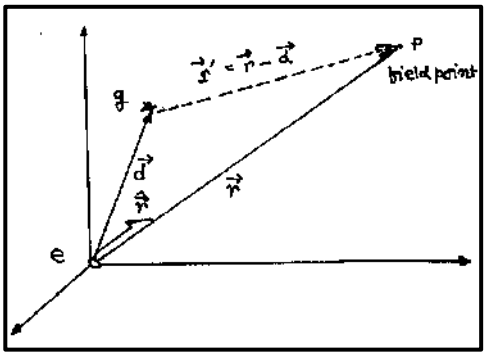

Fig. 1 A system of electric charge (e) and a magnetic charge g separated by a distance $d = |\vec{d}|$. The electric charge (e) is placed at the origin.

$$\vec{\mathrm{P}}_F = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{4\pi c} \qquad \ldots(10)$$

is the field momentum density (connected with the pointing vector $\vec{S} = \frac{c}{4\pi}\vec{E} \times \vec{B}$ by the relation $\vec{\mathrm{P}}_F = \frac{\vec{S}}{c^2}$) . Hence

$$\begin{aligned} \vec{L}_{em} &= \frac{1}{4\pi c}\int \vec{r} \times (\vec{E} \times \vec{B}) d^3\vec{r} \\ &= \frac{e}{4\pi c}\int \frac{\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{B})}{r^3} d^3\vec{r}\ ; \quad \text{using (8)} \\ &= \frac{e}{4\pi c}\int \frac{(\hat{\vec{r}} \cdot \vec{B})\hat{\vec{r}} - \vec{B}}{r} d^3\vec{r} \end{aligned} \qquad \ldots(11)$$

where $\hat{\vec{r}} = \frac{\vec{r}}{r}$ is the unit vector along the direction of $\vec{r}$ [Fig.1].

We now use the vector identity,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\vec{B}\hat{\vec{r}}) &= \hat{\vec{r}}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\hat{\vec{r}} \\ &= \hat{\vec{r}}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) + \frac{\vec{B}}{r} - \frac{(\vec{B} \cdot \hat{\vec{r}})\hat{\vec{r}}}{r} \end{aligned} \qquad \ldots(12)$$

This gives

$$\frac{1}{r}[\hat{\vec{r}}(\hat{\vec{r}}\cdot\vec{B})-\vec{B}]=\hat{\vec{r}}(\vec{\nabla}\cdot\vec{B})-\vec{\nabla}\cdot(\vec{B}\hat{\vec{r}}) \qquad ...(13)$$

With the use of (13), the Eq. (11) becomes

$$\vec{L}_{em}=\frac{e}{4\pi c}\int[\hat{\vec{r}}(\vec{\nabla}\cdot\vec{B})-\vec{\nabla}\cdot(\vec{B}\hat{\vec{r}})]d^3\vec{r} \qquad ...(14)$$

The second integral on the right side of (14) can be converted into a surface integral (with the application of divergence theorem) and can be made vanishingly small in the limit $r\to\infty$. Then, we have

$$\vec{L}_{em}=\frac{e}{4\pi c}\int\hat{\vec{r}}(\vec{\nabla}\cdot\vec{B})d^3\vec{r} \qquad ...(15)$$

Since we are dealing with a point monopole of charge *g* at $\vec{r}=\vec{d}$ [Fig.1], we have

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=4\pi g\delta^3(\vec{r}-\vec{d}) \qquad ...(16)$$

Plugging this result into the right side of (15) yields

$$\vec{L}_{em}=\frac{eg}{c}\int\hat{\vec{r}}\delta^3(\vec{r}-\vec{d})d^3\vec{r}=\frac{eg}{c}\vec{d};\quad \vec{d}=\frac{\vec{d}}{d} \qquad ...(17)$$

The above equation shows that the combination of magnetic and electric charge has an angular momentum which is independent of magnitude of separation-distance $d=|\vec{d}|$ between *e* and *g*,

$$L_{em}=|\vec{L}_{em}|=\frac{eg}{c} \qquad \text{(fixed)} \qquad ...(18)$$

Quantum mechanically one may now put the quantisation hypothesis for angular momentum in units of $\hbar/2$. This dictates that

$$L_{em}=\frac{eg}{c}=n\frac{\hbar}{2};\quad n=\pm1,\pm2,\cdots \qquad ...(19)$$

which reproduces the Dirac's charge quantization condition (7). Discrete nature of electric charge thus follows even from the existence of a single monopole. The smallest value of $|eg/c|$ would be the case for $n = 1$.

The electric charge *e* satisfies the condition,

$$\frac{e^2}{\hbar c}=\frac{1}{137}=\alpha \qquad ...(20)$$

where the dimensionless quantity α is called the fine-structure constant[§] (because it corresponds to the ratio of atomic fine structure energy-splitting to the principal quantum number energy splitting) and is taken as the measure of the strength of electromagnetic interaction. From (19) and (20), it follows that the smallest value of magnetic charge would satisfy the "magnetic fine structure constant".

$$\frac{g^2}{\hbar c} = \frac{137}{4} \qquad ...(21)$$

Such monopoles are commonly called the "Dirac monopoles".

Since α is a small number (α≅1/137), the basic electromagnetic interaction is relatively weak (relative to strong interaction, the strength of electromagnetic interaction is of the order of 10^{-2}). However it has strong consequence because of its long range (~$1/r^2$) and that huge number of charges can participate in this interaction. Equation (21) reveals that the magnetic coupling strength is enormous (even greater than or of the order of strong-interaction). This fact is used in search of magnetic monopoles whenever, as stated already, new energy range is opened up in high energy domain. So far we have only negative evidence.

You never know what is enough until you know what is more than enough. - William Blake

References

[1] P. A. M Dirac: Proc. Royal Sc. A123, 60 (1931)
Phys. Rev. 74, 817 (1948)

[2] Classical Electrodynamics [Sects, 6.11, 6.12] (3rd Edn) - Jackson and references cited there.

[3] M. N. Saha: Indian J. Of Physics 10, 141 (1936)
Phys. Rev 75, 1968 (1949)

[§] In SI units, $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\hbar c$. Most precise determination (in the year 2000) gives $\alpha = \frac{1}{137.036}$.

– Kaustav Maitra, 2nd year

– Sanchali Saha, 2nd year

– Shuvadeep Dey, 2nd year

জন্মান্তর

(একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

– অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক

একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর - নাম শান্তশীল। ওই শহরেরই তালতলায় আমাদের বাড়ী। আর আমার ছোটোবেলার বন্ধু ও সহপাঠী রমেনের বাড়ী আমতলায়। রমেনরা দু'ভাই; দু'বছরের ছোটো ভাই হল রণেশ। দু'জনেই এম. ভট্টাচার্য আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। রণেশ ছাত্র হিসাবে অসম্ভব মেধাবী। ক্লাসে শুধু প্রথম হওয়া নয়, প্রতিটি ক্লাসে প্রায়শই প্রতি বিষয়ে প্রথম।

একসময় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হল। রণেশ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেল, সঙ্গে ছ'টা বিষয়ে লেটার মার্ক্স্। উচ্চমাধ্যমিকে হল প্রথম, পাঁচটা বিষয়ে লেটার মার্ক্স্সহ। স্কলারশিপ নিয়ে পদার্থবিদ্যায় বি.এসসি. অনার্সে ভর্তি হল ও ফার্স্ট ক্লাস পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে স্পেশাল পেপারসহ এম.এসসি. (পদার্থ বিজ্ঞান) পড়ল। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হল।

প্রফেসর ডঃ জ্যোতির্ময় দাশগুপ্তের অধীনে পি.এইচ.ডি.-র গবেষণার কাজ শুরু করল। ওর এই স্যারই ওকে বিগত তিন-চার বছর ধরে উৎসাহিত করে গেছে পড়াশোনায়। শুধু তাই নয়, এখনকার কাজ করা এক বছর পেরোয়নি, একদিন ওর দাদা রমেনের সামনেই স্যার বলে দিল - 'আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বোসের পরে পরামাণু বিজ্ঞানে এত স্বচ্ছ ধারণা, বিচার বিশ্লেষণ ও চিন্তা ভাবনা খুব কমই হয়েছে। আমি রণেশের মধ্যে দেশের গর্বিত হওয়ার মত কিছু দেখতে পাচ্ছি।'

ছাত্র-শিক্ষকের গবেষণার কাজ চলেছে ভালই। এর মধ্যে ছ'টা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়ে গেছে জার্মেনী থেকে। তিন বছর শেষ না হতেই রণেশের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী হয়ে গেল। এরপরও সে চাকুরীতে যোগ না দিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেল ডঃ দাশগুপ্তের অধীনেই। পি.এইচ.ডি. করার পর দশ মাসের মাথায় মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওর ডাক এল। ওর সাম্প্রতিককালের দু'টো গবেষণাপত্র নিয়ে রণেশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশানাল সেমিনারে বক্তৃতা দিতে হবে। যাতায়াত, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি সব খরচাদি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করবে। প্রয়োজন হলে ও সঙ্গে একজনকে নিতেই পারে, যার সব খরচও তারাই দেবে। যাত্রার দিন ঠিক হল। রণেশের সঙ্গে যাবেন তারই গাইড প্রফেসর দাশগুপ্ত।

ইতিমধ্যে রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে রীতিমত আলোচিত হচ্ছে - বিশেষত ওর গবেষণাপত্রের অনুরূপ বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, সেই সব বিজ্ঞানীমহলে।

যথাসময়ে প্রফেসর (ডঃ) জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও বর্তমানে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী (মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের চিঠিতে এই সম্বোধনেই তাঁকে উল্লেখ করেছে)। ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে বিমান বন্দরে উপস্থিত হন।

ইতিমধ্যে শহর ভেঙ্গে পড়েছে বিমান বন্দরে। সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ ও ছবি। সাংবাদিক ও প্রায় পাঁচ/সাতশ জনতার ভিড় সামলাতে পুলিশ উপস্থিত হয়ে গেছে গেটের কাছে। ধীর, স্থির, শান্ত এই নতুন পরমাণু বিজ্ঞানী তাঁর উপদেষ্টা ও স্যারকে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে উপস্থিত সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ধীর পায়ে বিমান বন্দরের গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বার বার জ্বলে উঠল।

পরদিনের সংবাদপত্রেও তাঁর খবর, তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিষয়ে দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হল।

তৃতীয় দিনে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে বিজ্ঞানী রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের গবেষণাপত্রের উপর বক্তব্য রাখার কথা সকাল এগারোটায়। ভোরে উঠে স্নান সেরে পোশাক পরে শ্রী দাশগুপ্ত ও শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় তৈরী হয়ে নিল। সাথে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, স্লাইড ইত্যাদি নিতে ভুলল না। টাই স্যুটও পরা হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট নিয়ে হোটেল বয় এক্ষুনি রুমে আসার কথা। পাশের রুম থেকে ওর স্যারও পুরোপুরি তৈরী হয়ে ওর ঘরে এসে গেছে।

সোফায় বসতে গিয়ে হঠাত্ মাথাটা চক্কর দিল রণেশের। বুকে ব্যাথা অনুভব করল। সোফাতে বসে থাকা অবস্থাতেই মাথাটা এলিয়ে পড়লো বাঁপাশে। চোখের পাতা বুজে এল। 'কি হল, কি হল' - বলে ছাত্রকে ধরতে যাবে ডঃ দাশগুপ্ত, ঠিক তক্ষুনি খোলা দরজা দিয়ে হোটেল বয় ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঢুকে পড়ল রুমে, আর ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়কে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সোজা ম্যানেজারের কাছে দৌড়ে গেল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ রুমে এসে গেল ম্যানেজার ও দুই রক্ষী। পুলিশকে খবর দেবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনজন এসে উপস্থিত। ডঃ দাশগুপ্ত তো অবাক হয়ে গেছেন। ভাবছেন - 'হার্ট অ্যাটাক, সেলিব্রেল অ্যাটাক, না অন্য কিছু? কেনই বা এমন হল?' তাঁর মন খারাপ এতটাই হল যে তিনি সামলাতে পারলেন না নিজেকে। ছেলের মত ভালবাসতেন রণেশকে। তার চলে যাওয়া মানে সব কিছু শেষ। দু'চোখে জলের ধারা। তাঁদের দু'জনের গবেষণার কাঠামোটাই এবারে ভেঙে চূর চূর হয়ে যাবে। একটি রত্নের হঠাৎ এই পরিণতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন রীতিমত।

কিন্তু হলে হবে কি? এত দুঃখের মধ্যেও পুলিশ অফিসার জানালেন - প্রফেসর দাশগুপ্তকে ওরা নিয়মানুসারে একবার থানায় নিয়ে যাবেন এখুনি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই প্রফেসর এসে পৌঁছলেন এই দুঃসংবাদের খবর পেয়ে। তাঁরা জানালেন - 'এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেজেন্টেশনই মুখ্য। সম্মেলন ঠিক এগারোটায় শুরু হওয়ার কথা। এখন ন'টা দশ মিনিট হয়েছে।' উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বললেন - 'কি করা যায় আপনারা বলুন। দেশ-বিদেশের সব প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা এসে গেছেন।' সবাই চুপ - এরপরই পরিস্থিতি বিচার করে তাঁরাই প্রস্তাব করেন - 'উপদেষ্টা ও গাইড হিসেবে ডঃ দাশগুপ্ত যদি প্রেজেন্টেশনটা করে দেন, তাহলে আপাতত মুখরক্ষা হয়। বলা হবে - 'ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তার পক্ষে আসা সম্ভব নয় এখন, ডাক্তারের চিকিৎসায় আছেন।'

দু-চার বার অনুরোধ উপরোধ করার পর প্রফেসর দাশগুপ্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। পুলিশ অফিসারকে সম্মেলনের কাগজপত্র দেখানোর পর তারা জানালেন - 'আপাতত অল্প সময়ের জন্য হলেও আগে ডঃ দাশগুপ্তকে থানায় যেতেই হবে দু'একটা কাগজে ও রেজিস্টারে সই করার জন্য।'

ইতিমধ্যে হোটেলের ডাক্তার এবং সম্মেলন স্থলের একজন ডাক্তার পরীক্ষার পর জানালেন - 'ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহে প্রাণ নেই।' অগত্যা পোস্টমর্টেমের জন্য দেহ নিয়ে যাওয়া হল।

ডঃ দাশগুপ্ত ও সম্মেলনের উদ্যোক্তা দুই প্রফেসর পুলিশের সাথে থানায় গিয়ে প্রয়োজনীয় সই সাবুদ করে সম্মেলনে পৌঁছলেন, ঘড়িতে তখন বেলা দশটা তিরিশ মিনিট।

বিশাল ব্যবস্থাপনা। প্রচুর বিজ্ঞানী উপস্থিত। নির্দিষ্ট সময়ে প্রফেসর জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত মঞ্চে উঠলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন অধ্যাপক ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসুস্থতার কথা জানিয়ে বললেন - তারই গাইড প্রফেসর দাশগুপ্ত ঐ গবেষণাপত্র পড়ে শোনাবেন এবং আপনাদের প্রশ্নাবলীর উত্তরও দেবেন। যথারীতি তাই হল। প্রশ্নও অনেক হল। ঐ গবেষণাপত্রের ও কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন উপস্থিত প্রখ্যাত সব বিজ্ঞানী।

কাজটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে জার্মেনীর এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী - ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের দু'জন বিজ্ঞানীর সাথে সহমত হয়ে উক্ত কাজের জন্য নোবেল কমিটিকে আগামী দিনে 'নোবেল প্রাইজ' প্রদানের জন্য সুপারিশ করে তিন তিনটি চিঠি সেদিনই পাঠিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে জার্মেনীর সংবাদমাধ্যম এ বিষয়ে তাদের মত করে বিশেষ সংবাদ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে দেশে বিতরণ করল। নেটে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

অন্যদিকে বিজ্ঞান সম্মেলন শেষ হতেই থানার দুই পুলিশ অফিসার ডঃ দাশগুপ্তকে আটক করে আদালতে পেশ করে। বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠান।

তিনদিন পর জামিনে মুক্ত হয়ে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পোস্টমর্টেম করা মৃতদেহ বাক্সবন্দী অবস্থায় নিয়ে ডঃ জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান।

আর তখনই শুরু হয়ে যায় প্রবল হৈ চৈ। মোদ্দা কথা হল ডঃ দাশগুপ্ত এই মৃত্যুর জন্য কোন না কোনভাবে দায়ী - একথাই ঝড়ের বেগে প্রচারিত হয়ে পড়ে সারা শহরের জনতার মুখে মুখে। হাজারো প্রশ্নবাণ ছুটে আসে তাঁর দিকে।

- 'আপনি কি করে এমন প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানীকে মারতে পারলেন?'
- 'আপনার হাত কাঁপল না?'
- 'ক'টা ঘুমের ঔষধ দিয়েছিলেন?'
- 'না কি অন্য কিছু দিয়ে .... ?'
- 'তিনি তো আপনারই ছাত্র ছিলেন; তাও এইভাবে - বিদেশে?'
- 'আপনার কোন আফসোস হচ্ছেনা এই অপকর্মের জন্য?'
- 'আপনি এতটাই নিষ্ঠুর হতে পারলেন?'
- 'আপনি কি মনে করেন - আপনার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত?'
- এমনি আরও কত কি!

ডঃ দাশগুপ্তকে নিতে এক আত্মীয় এসেছিলেন গাড়ী নিয়ে। অনেক কষ্টে তাঁকে নিয়ে বাড়ীর দিকে যেতে পারলেন - শেষ পর্যন্ত। বাস্তবে ডঃ দাশগুপ্তের কোন দোষই নেই - ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য।

এমনিতেই তিনি মর্মাহত। তারমধ্যে বিদেশে থানা পুলিশ হয়েছে, তিন দিন আটক ছিলেন। অজস্র মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। দেশে বিদেশে সর্বত্র সংবাদমাধ্যমে তাঁকে 'লোভী', 'হিংসুটে অধ্যাপক', 'ছাত্র খুনী', 'বিজ্ঞানীর মৃত্যুর জন্য দায়ী' ইত্যাদি শব্দবন্ধে ভূষিত করা হয়েছে।

বাড়ী পৌঁছে অবধি প্রফেসর দাশগুপ্ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে একটি কথাও বলেননা, বলতে পারছেন না - এতটাই আঘাত পেয়েছেন মনে। কিছু বলতে গেলেই একটা গোঁগোঁ শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে।

কেস চলল জার্মেনীর আদালতে। ভারতীয় দূতাবাস আইনজীবি দিয়ে কেসটা চালাল। ছ'মাস পর রায় বের হলো – 'ডঃ দাশগুপ্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। তার জন্য ডঃ দাশগুপ্ত কোনভাবেই দায়ী নন।'

কিন্তু ততদিনে অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে। ভারতে তো নয়ই, পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দুই-তিনটি সংবাদপত্রে ভেতরের পাতায় ছোট করে রায়টা সংক্ষিপ্ত আকারে বেরিয়েছে। লোকেদের চোখে পড়ার কথা নয়। তাছাড়া তারা ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

বিদেশ থেকে ফিরে আর একদিনের জন্যও ডঃ জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরীর দিকে পা বাড়াননি। বাড়ীতেই নিজস্ব স্টাডিরুমে চুপচাপ বসে থাকেন। কেউ সামনে গেলে অপরাধীর মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকেন।

এদিকে আমাদের পাশের বাড়ীতে রণেশের মৃত্যুর এক বছরের মাথায় একটি ছেলের জন্ম হল। ওকে দেখতে গিয়ে আমি রীতিমত আঁতকে উঠলাম। পরের দিন বন্ধু রমেনকে নিয়ে আবার গেলাম দেখতে। নবজাতক শিশুটি রমেনের কোলে ঝাঁপিয়ে চলে এল। তারপর রমেন ও নবজাতক পরস্পর দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। আমি দেখলাম - কারও চোখের পাতা নড়ছেনা। ওরা যেন কতদিনের চেনা। আমরা দুই বন্ধুই অবাক হলাম - এই ভেবে যে - এমনটাও হয়? আর অন্য কিছু ভাববার অবকশ কোথায়?

ঐ ছেলের নাম রাখা হল চিরঞ্জিত, বা চিরঞ্জিত ঘোষাল। ছেলেটি বড় হল, ঐ বিখ্যাত স্কুলেই ভর্তি হল। সেই মেধা, - রণেশের যেমনটা ছিল। সেই অবাক করা রেজাল্ট। কয়েকজন শিক্ষক বললেন - বেশ ক'বছর পর রণেশের পর্যায়ের একটি ছাত্র পাওয়া গেল - যে আবার স্কুলের নাম বাড়াবে।

আমি আর আমার বন্ধু রমেণ দু'জনেই ওর হাবভাব, কথাবার্তা, মেধা ও রেজাল্ট দেখে দেখে আঁতকে উঠছি। এ যেন সেই রণেশ, রমেনের ছোট ভাই। কাউকে বলতে পারছিনা এসব কথা। এটা কি সম্ভব? এটা কি জন্মান্তর? পুনর্জন্ম? সুদূর জার্মেনীর মিউনিকে দেহত্যাগ করার পর শান্তশীলের মত ছোট্ট কিন্তু সুন্দর এই শহরের তালতলার ঘোষাল পরিবারে রণেশই এসে জন্ম নিয়েছে। তাঁর অতৃপ্ত আত্মা জন্ম নিয়েছে। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য। ভাবতেই অবাক লাগে। এটা কি করে সম্ভব? বিজ্ঞান কি বলে? ঐ বিজ্ঞানী কেন কিভাবে কোন উদ্দেশ্যে এভাবে আসতে পারে? জন্ম নিতে পারে? অথচ একই আচরণ, একই মেধা, দেখতেও অনেকটা একরকম। - এসব ভাবছিলাম ঘরে বসে। রমেন এল - হাতে শ্রীশ্রী গীতা। উপনয়নের পর ও প্রতিদিন গীতা পাঠ করে, অন্তত কিছুটা। আমার চোখের সামনে ও শ্রীশ্রী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২তম শ্লোক খুলে ধরল। - ওখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনরূপী বিশ্বমানবতাকে - 'মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে।'

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরহপরানি।
তথাশরীরানি বিহায় জীর্ণা
নন্যাতি সংযাতি নবানি দেহী।।" ২/২২

- 'এ জন্মের চাওয়া পাওয়া, এই জন্মের মেধা, শিক্ষা, বুদ্ধি, জ্ঞান - আশা আকাঙ্ক্ষা - সব কিছু ঐ আত্মার সঙ্গে যায়। আত্মা পূর্ণতা লাভ করতে চায়, পরমাত্মায় মিলিত হতে চায়। ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ

করতে চায়।'

- এসব বই থেকে, মানে গীতা থেকে বলার পর রমেন বলে - 'ও মানে রণেশের তো একটা ইচ্ছা, একটা স্বাদ, একটা আকাঙ্ক্ষা ছিলই ঐ বিজ্ঞানীদের সামনে কিছু বলার। শরীর ছিল না। কিন্তু আত্মার ইচ্ছাপূরণ হয়নি। তাই এই নবজন্ম।'

' কিন্তু এতদূরে, এখানে কেন, এই শহরে, আমাদের চোখের সামনে কেন? কি ইঙ্গিত করছে এটা?' - আমি বলি।

রমেন - 'দেখ্, স্যার মানে ডঃ দাশগুপ্ত ওর সব। যা কিছু এ ব্যাপারে করেছে, শিখেছে, তাঁর সাহায্যেই হয়েছে। ভবিষ্যতে কিছু করতে হলে তাঁরই সাহায্যে হবে। তিনি তো এখানেই, তাও কথা বলতে পারেননা। অনেক অপমানিত হয়েছেন। ও যদি রণেশই হয়ে থাকে, স্যারকে ধরেই এগোবে। বিদেশে কে চিনবে ওকে? আর আমাদের চোখের সামনে আসা মানে - আমাদের সাহায্য চাই - তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে।'

আমি - 'কিন্তু এসব বিষয় কাউকে বলা যাবে না, সংবাদমাধ্যমকে তো নয়ই, সবটাই ঘেঁটে যাবে। চল্ অপেক্ষা করে আমরা ব্যাপারটা দেখি। পরে এ বিষয়ে লেখালেখি করা যাবে।'

চিরঞ্জিত বড় হয়েছে। অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে। রণেশের মত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বি.এসসি. অনার্স, এম.এসসি.-তে আশাতীত রেজাল্ট করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

শুধু আমি আর রমেন দেখে যাচ্ছি সব কিছু। অন্যদের সাথে এবিষয়ে কোন কথা নয় এখন। আর কেউ ব্যাপারটা জানে না, লক্ষ্য করেনি সেভাবে। তাই মাথাও ঘামায়নি।

এবারে ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের যে বিষয়টা নিয়ে পি.এইচ.ডি করার জন্য গবেষণা করবে বলে ভেবেছে তেমন গাইড করার মত কোন প্রফেসর বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। চিরঞ্জিত এরপর নিজে নিজেই বিষয়টার ওপর লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখল যে - দু'টো নাম বারবার উঠে আসছে এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, - যাঁরা এমন সব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন, - যা পৃথিবীর আর কোন ল্যাবরেটরীতে হয়নি।

শুরু হল চিরঞ্জিতের খোঁজ নেওয়া। অন্য প্রফেসররা এই বিশেষ মেধাসম্পন্ন ছাত্রকে পাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, বুঝিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। শেষ পর্যন্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রায়ের সন্ধান পেল চিরঞ্জিত - যিনি ঐ গবেষণার বিষয়ে কিছুটা জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন একদিন। কিন্তু এগোতে পারেননি, হোঁচট খেয়েছেন। তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি চিরঞ্জিতকে তাঁর চন্দ্রপুরের বাড়ীতে যেতে বললেন সময় করে।

অতি উৎসাহে সে একদিন বেলা তিনটায় ঐ প্রফেসর রায়ের বাড়ীতে পৌঁছে গেল। গিয়ে সে যা দেখল, বুঝল, জানতে পারল, তাতে তার মাথা ঘুরে গেল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রফেসর ডঃ জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত ও তার সুযোগ্য অদ্ভুত মেধা সম্পন্নছাত্র ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষয়ে নিখুঁতভাবে যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা দিলেন প্রফেসর রায়। শুধু তাই নয়, ডঃ দাশগুপ্তের বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং ঐ সময়ের যাবতীয় দেশি বিদেশি সংবাদপত্রের কাটিং, যাতে ডঃ দাশগুপ্ত ও তার প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে লেখা হয়েছে, - সব দেখালেন চিরঞ্জিতকে। সব শুনে একদম চুপ হয়ে গেল সে। আসলে প্রফেসর রায় ও প্রফেসর দাশগুপ্ত দু'জনে পরম বন্ধু ছিলেন ছোটোবেলা থেকেই। ফলে প্রফেসর দাশগুপ্তের ব্যক্তিগত আঘাত প্রফেসর রায়কেও কষ্ট দিয়েছে।

এরপর সাত দিন কেটে গেল। একদিন রবিবারে সকালে রমেন ও আমি চিরঞ্জিতকে নিয়ে রমেনের বাড়ীতে গেলাম - ওকে নতুন বিশেষ কিছু দেখাব বলে। রণেশের ঘরে ওর সমস্ত জিনিসপত্র ইচ্ছে করেই সাজিয়ে রেখে চিরঞ্জিতকে ঐ ঘরে বসিয়ে দিয়ে আমি অসুস্থ মাসীমাকে ভেতরে একটু দেখে আসি বলে রমেনকে নিয়ে ঐ ঘর থেকে বের হলাম। আবার লুকিয়ে পাশের দরজার আড়াল থেকে নজর রাখলাম - চিরঞ্জিতের প্রতিক্রিয়া কি? রমেনদের বাবা দশ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। মা শয্যাশায়ী হয়েছেন ছেলের শোকে। জার্মেনীতে ওর মারা যাবার পর থেকেই।

রণেশের ঘরে একা চিরঞ্জিত। রণেশের ছবি, গবেষণাপত্র, ওর জামাকাপড়, টেবিল চেয়ার চিরুনি থেকে শুরু করে সব কিছু চিরঞ্জিতের ভীষণ চেনা। প্রায় আধ ঘন্টা পর রমেন ঘরে ঢুকে দেখে চিরঞ্জিতের চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। এরপর আমি আর রমেন চিরঞ্জিতকে নিয়ে ভেতরে রমেনের মায়ের কাছে নিয়ে এলাম। মা দেখেই বলল - কি রে রণেশ? এতদিন কোথায় ছিলি বাবা?

চিরঞ্জিত হঠাৎই 'মা' বলে ডেকে উঠল।

- 'তুমি শুয়ে আছো কেন, মা?'

পূর্বজন্মের মা ছেলের মিলন ঘটল। - এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি, এবং কিভাবে, কেন এমন হল, - এমন শত প্রশ্ন আসতেই পারে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের চোখের সামনে। সাক্ষী এই লেখক, সাক্ষী আমার বন্ধু রমেন। মিথ্যে বলে, মিথ্যে জানিয়ে আমাদের কি লাভ?

চিরঞ্জিতের পূর্বজীবনের স্মৃতি ফিরে এসেছিল ঘন্টাখানেক আগেই। এ বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। বাড়ী ফিরে চিরঞ্জিতের একে একে মনে পড়ল ডঃ দাশগুপ্তের সাথে বিদেশ যাত্রা এবং তার আগে পরের সব কিছু।

সত্যি সত্যিই হার্ট অ্যাটাক হয়ে চলে গিয়েছিলেন পৃথিবী ছেড়ে। আগের রাত্তিরে ঘুম এসেছিল যখন, তখন ঘড়িতে রাত তিনটে (ওখানকার সময়ে)। গভীর উত্তেজনা ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের প্রেজেন্টেশন নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখেছেন - জার্মেনীতে আইনস্টাইনের সাথে বসে কথা বলছেন। মিউনিক বা বার্লিনে বা জার্মেনীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সেমিনারে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নিয়ে বক্তব্য রাখছেন তিনি এবং উপস্থিত দেশ বিদেশের সমস্ত বিজ্ঞানীর নানা প্রশ্নের উত্তর সাবলীলভাবে দিয়ে চলেছেন ইত্যাদি।

এর দু'দিন পর প্রফেসর দাশগুপ্তের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল চিরঞ্জিত ঘোষাল। ডঃ দাশগুপ্তের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র বাড়ীতেই ছিল। ডঃ দাশগুপ্ত সেই স্টাডি রুম ছেড়ে বাইরে বেরোন না। ওখানেই তাঁর জন্য সব ব্যবস্থা রয়েছে। চিরঞ্জিত নিজের পরিচয় দিয়ে প্রফেসর রায়ের লেখা একখানা চিঠি ছেলের হাতে তুলে দিলেন, আর মাত্র আধ ঘন্টা সময় চেয়ে নিলেন ওদের কাছ থেকে। চিঠি পড়ে চিরঞ্জিতকে ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল।

এর পর আধ ঘন্টা কেন, তিন ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল - ডঃ দাশগুপ্ত চিরঞ্জিতকে ছাড়তেই চায় না। এই প্রথম এতকাল পর ডঃ দাশগুপ্ত পরিষ্কার উচ্চারণে কথা বললেন। ঘরের দরজা হাট করেই খোলা ছিল। পরিবারের লোকজন বাইরে থেকে দেখলেন - ওরা দু'জন হাসছে, গল্প করছে, এক অন্যকে কি সব জিজ্ঞেস করছে। ডঃ দাশগুপ্ত আবার হোহো করে হাসছেন। চিরঞ্জিত দ্বিতীয়বার প্রণাম করল। ওর চোখে জলও এল। কথা শুনতে পায়নি কেউ।

একটু পরে ডঃ দাশগুপ্ত উঠে দরজাটা বন্ধ করলেন। ওদের মধ্যে এবারে কি হল, কি কথা হল - ঘরের লোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিরঞ্জিত দরজাটা খুলে দিল। ডঃ দাশগুপ্ত আগের অবস্থায় ষোল আনা ফিরে এসেছেন। দরজার কাছে এসে বললেন - ওকে আর আমাকে একটু চা-বিস্কুট দাও।

আরও কথা হল। একটা খাতা নিয়ে কিছু লেখা হল। ব্যাগ থেকে একটা বই নিয়ে খুলে কিছু আলোচনা হল। চা-বিস্কুট এল। স্যারের কোনদিন কোন অসুস্থতা ছিল বলে কেউ বলবেনা। এরপর স্যারকে তৃতীয়বার প্রণাম করে চিরঞ্জিত বাইরে বেরিয়ে এল। পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেছেন স্যার - চিরঞ্জিত বাড়ীর সবাইকে জানিয়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

পরের মাসে ডঃ দাশগুপ্তের কাছে নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে একখানা চিঠি এল। নোবেল কমিটি লিখছেন -

'আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনি জানিয়েছেন যে ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুনর্জন্ম হয়েছে। তার নতুন নাম শ্রী চিরঞ্জিত ঘোষাল। এ বিষয়ে আপনি পরিপূর্ণ প্রমাণ পেয়েছেন এবং তাই এতে আপনার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।

এ বিষয়ে আপনাকে জানাই যে - জন্মান্তরবাদে আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনটাই নেই। গড্ বা আল্লাহ্ বা পরমেশ্বরকে যেমন দেখা যায় না, শুধু বিশ্বাস করে চলেছে সব বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন, তেমনি আপনি এবং আরও এমন কোটি কোটি মানুষ জন্মান্তরে ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। আমাদের কমটির তেরোজনের মধ্যে দু'জন সর্বান্তরকরণে বিশ্বাস করেন এটি। অন্যদের মধ্যে দু'জন বাদে বাকিরা বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনটাই করেননা।

যদিও আপনার পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয়ে একটি বৈপ্লবিক গবেষণার অবতারণা করেছেন তার গবেষণায় এবং সেমিনারে উপস্থিত প্রায় সব বিজ্ঞানীই বিষয়টার প্রভূত প্রশংসা করেছেন, সেজন্যে তাঁকে নোবেল কমিটি এবছর পদার্থবিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন।

কিন্তু যেহেতু তাঁর হঠাৎ দেহত্যাগের পর আপনিই গবেষণাপত্রটি উপস্থাপিত করেন, তাই এই পুরস্কার আপনার হাতেই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আপনি জানিয়েছেন ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুনর্জন্ম হয়েছে। অতএব আপনার বিশ্বাস ও প্রমাণ পাওয়াকে পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে আপনার অনুরোধক্রমেই এই 'নোবেল প্রাইজ' শ্রী চিরঞ্জিত ঘোষালের হাতেই আগামী ৭ই জুলাই ২০১৮ ইং তারিখে তুলে দেব। সব খরচ যথা যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি নোবেল কমিটির।

আশাকরি আপনারা উভয়ে উপস্থিত থাকবেন।'

এই চিঠিখানার একটা কপি এবং চিরঞ্জিত ও রণেশের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানিয়ে ও জার্মেনীর আদালতের রায়ের কপিসহ প্রফেসর রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ও টি.ভি. চ্যানেলে পাঠালেন সংবাদ পরিবেশনের জন্য। এরপর চিঠি দিয়ে বা ফেসবুকে বা সাক্ষাৎ করে প্রফেসর দাশগুপ্তের কাছে শত শত ক্ষমা চাওয়ার ও দুঃখ প্রকাশ করার চিঠি/লেখা পৌঁছল।

৭ই জুলাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' তুলে দেওয়া হল শ্রী চিরঞ্জিত ঘোষালের (তথা ডঃ রণেশ গঙ্গোপাধ্যায়) হাতে।

এরপর শুরু হল অন্য গবেষণা –

বিষয় :- 'জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জন্ম'।।

ধর্মজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান

– অমিতাভ পাল, প্রাক্তন অধ্যাপক

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্ঠির এবং শকুনির মধ্যে পুনরায় পাশা খেলা হয়। যে খেলাটি "তৃতীয় দ্যুতক্রীড়া" নামে পরিচিত। এই খেলায় যুধিষ্ঠিরের পাশা তৈরী করেন মৎকুনি; যিনি শকুনির অনুজ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে বৈষয়িক গোলযোগের ফলে তিনি বিপক্ষ শিবিরে যোগদান করেন। শকুনির পাশার কূট-কাচালি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি যে পাশা তৈরী করিবেন সেই পাশা নিয়ে খেলায় যুধিষ্ঠির অবশ্যই জয়লাভ করিবেন; অন্যথায় তিনি প্রাণদন্ড গ্রহণ করিবেন, এমনকি দ্যুতক্রীড়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পান্ডবশিবিরে নিজেকে জামিন রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর তৈরী পাশাটিও যে শকুনির পাশাটির ন্যায় কূট-কাচালিতে ভরপুর সেই সত্যটি মৎকুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। শকুনি এবং মৎকুনির পাশা দুইটি মহাভারতের সময় (দ্বাপরযুগে) কূট পাশা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রদর্শিত পরিকাল্পনিক চিত্রের (Schematic diagram) সাহায্যে শকুনি এবং মৎকুনির তৈরী পাশা দুইটির গঠনশৈলী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শকুনির পাশা

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদি

(১) গান্ধার রাজ (শকুনি ও মৎকুনির পিতা) -এর অস্থি

(২) অস্থি কর্তনের উপযোগী করাত (Bone Saw)

(৩) অস্থি খোদাই-এর উপযোগী খনক (Bone Driller)

(৪) "গুবরে পোকা" নামক কীট

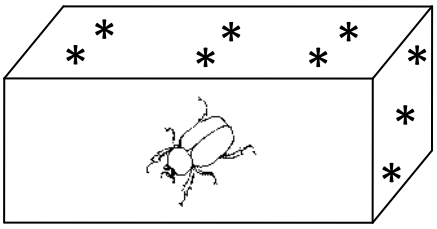

চিত্র ১ : শকুনির পাশা

কূটনীতি

পাশাটি যেভাবেই চালা হউক না কেন গুবরে পোকা সর্বদা উপুড় হইয়া থাকিবে চিত্র ১-এ যেমন দেখানো হইয়াছে।

গঠন পদ্ধতি (Construction Procedure)

(১) গান্ধার রাজ-এর অস্থিকে Bone Saw-এর সাহায্যে সমকোণী চৌপল (Rectangular Parallelopiped) -এর আকারে কাটা হয়।

(২) সাধারণ পাশায় সমকোণী চৌপলের ছয়টি পৃষ্ঠের প্রতিটিতে বিভিন্ন সংখ্যার তারকা (star) চিহ্ন (*) খোদাই করা হয়। যে কোন একটি পৃষ্ঠে একটি তারকা এবং উহার বিপরীত পৃষ্ঠে ছয়টি তারকা (চিত্র ২)। কর্তিত সমকোণী চৌপলের ছয়টি বহির্পৃষ্ঠের প্রতিটিতেই তারকা (*) খোদাই করা হয় এই নিয়মে -

প্রথম পৃষ্ঠে একটি *

দ্বিতীয় পৃষ্ঠে দুইটি **

তৃতীয় পৃষ্ঠে তিনটি ***

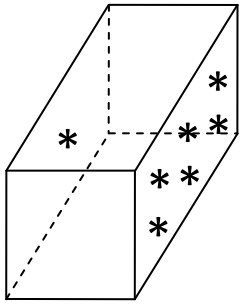

চিত্র ২

চতুর্থ পৃষ্ঠে চারটি ****
পঞ্চম পৃষ্ঠে পাঁচটি *****
এবং ষষ্ঠ পৃষ্ঠে ছয়টি ******

সাধারণত যে কোন একজোড়া বিপরীত পৃষ্ঠে মোট তারার সংখ্যা ৭ হয়, যেমন প্রথম ও ষষ্ঠ (১+৬), দ্বিতীয় ও পঞ্চম (২+৫) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ (৩+৪)।

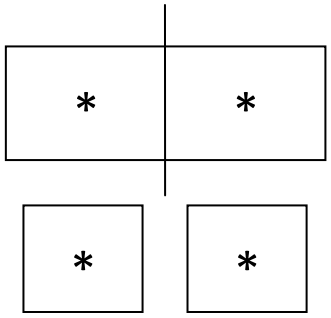

চিত্র ৩ : লম্বদ্বিখণ্ডিত পাশা

(৩) এইরূপে গঠিত পাশাটিকে দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে লম্বদ্বিখণ্ডিত করা হয়, চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) খণ্ডিত অংশদুটির প্রতিটিকে Bone Driller-এর সাহায্যে খোদাই করিয়া দুইটি ফাঁপা (hollow) চৌপল তৈরী করা হয়।

(৫) প্রদত্ত গুবরে পোকা নামক কীটকে ফাঁপা চৌপল দুইটি দ্বারা আবৃত করা হয় এবং নিখুঁতভাবে ফেভিকল দ্বারা যুক্ত করা হয় যাহাতে পুনরায় উহা একটি চৌপলে পরিণত হয়। এমনভাবে কীটকে চৌপল অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয় যাহাতে কীটের পৃষ্ঠ সংলগ্ন চৌপল তলের বহির্পৃষ্ঠটি ছয়টি (৬) তারকা দ্বারা খোদিত হয়।

ফলাফল

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গঠিত আয়তকার চৌপলটিকে আপাতদৃষ্টিতে একটি সরল পাশার ছক (dice) বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এই পাশা যেইভাবেই গড়াইয়া চাল দেওয়া হউক না কেন গুবরে পোকা নামক কীট সর্বদা নিজেকে ভূমির সাপেক্ষে উপুড় করার ফলে পাশার দানে সর্বদা উপরিতলে ছয়টি তারকা লক্ষিত হয়।

মৎকুনির পাশা

মৎকুনির পাশার (ক) প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, (খ) কূটনীতি এবং (গ) গঠন পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ সকলই শকুনির পাশার ন্যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম অদৃশ্য পাশা চালক হিসেবে "গুবরে পোকা" নামক কীটের পরিবর্তে "গোধিকা" নামক সরীসৃপ ব্যবহার করা হয়। ঐ পাশার পরিকাল্পনিক চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

যেহেতু তাহারা অনুভূমিক অবস্থানে পৃষ্ঠদেশ উর্দ্ধমুখী রাখিয়া থাকে অতএব এই পাশাটিরও প্রতিটি চালে উপরিতলে ছয়টি তারকা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে কৌরব এবং পান্ডবদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহা ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত। তৎপূর্বেই হস্তীনাপুর রাজপ্রাসাদে যে দ্যুতক্রীড়া (দৃশ্যত শকুনি ও যুধিষ্ঠির-এর মধ্যে) অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে গভীর জ্ঞানী (Deep knowledged) ব্যক্তিরা অধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়া থাকেন কিন্তু দ্বন্দ্ববাদী বস্তুজ্ঞানীরা (Dilectric materialist) প্রতিযোগিতা আখ্যা দিয়া থাকেন। দুই প্রকার আখ্যার তাৎপর্য অনুধাবনের নিমিত্তে উপোরোক্ত দ্যুতক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের পাশার দানে অপ্রত্যাশিত ভাবে ছয় তারকা প্রদর্শিত হয়। অবশ্য শকুনির পাশার দানও ছয় তারকা প্রাপ্ত হয়।

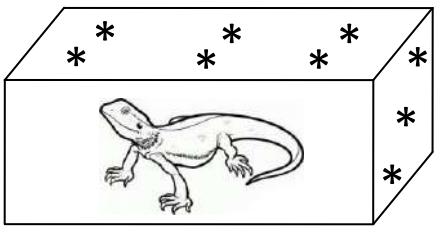

চিত্র ৪ : মৎকুনির পাশা

দ্বিতীয় দানেও যুধিষ্ঠির এবং শকুনি প্রত্যেকেই ছয় নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ শেষদানে যুধিষ্ঠির "ছক্কা" পাইলেও শকুনি "এক্কা" পাইলেন। অর্থাৎ শকুনির পরাজয় হইল। পান্ডবশিবিরের জয়ধ্বনিতে মহাকাশ বিদীর্ণপ্রায়। যুধিষ্ঠির শেষ দানটিতে ছয় তারকা দেখিয়া এমনই অভিভূত হন যে প্রক্ষেপণের পরে তিনি পাশাটিকে আর সংগ্রহ করেন নাই। এমত অবস্থায় শকুনির পাশা শুধুমাত্র একটি তারকাই প্রদর্শন করে নাই উহাতে সামান্য কম্পনও লক্ষিত হয়। শকুনি তৎক্ষণাৎ পাশাটি হস্তগত করেন। যুধিষ্ঠিরও নিজ পাশা সংগ্রহ করেন। পাশার কম্পন দেখিয়া বিচারক বলরাম (শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ) সন্দিহান চিত্তে উভয় পাশা পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত লইলেন এবং উভয়কে (যুধিষ্ঠির এবং শকুনি) তাঁহার নিকট পাশা প্রদান করিতে নির্দেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির পাশার অন্দরের সংবাদ অনবগত ছিলেন। তন্নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ পাশা প্রদান করেন। কিন্তু শকুনি পাশার গঠন প্রক্রিয়া (যাহা তাঁহারই মস্তিস্কপ্রসূত) বিলক্ষণ অবগত ছিলেন - তিনি পাশা প্রদানে আপত্তি করিলেন। আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। বলদেব চপেটাঘাত সহযোগে পাশাটি হস্তগত করিলেন। অতঃপর প্রবল বলপূর্বক দুইটি পাশাকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন। পাশাগুলির গঠন রহস্য পাঠকেরা অবগত আছেন। বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত "গুবরে পোকা" এবং "গোধিকা" এক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হইয়া সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইল। ক্ষুধিত গোধিকা "গুবরে পোকা"টিকে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণও করিল। অতঃপর প্রেক্ষাগৃহে (অর্থাৎ রাজসভায়) সমবেত ভদ্র এবং অভদ্রমণ্ডলী "কূট পাশা", "কূট পাশা" ধ্বনি তুলিয়া দ্যুতক্রীড়াকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করার দাবি করিলেন। বলাবাহুল্য ঐ সমবেত ভদ্রমন্ডলীর অধিকাংশই কৌরব পক্ষীয়। কিন্তু এই সময় স্থিতজ্ঞ বলদেব যে ফলাফল ঘোষণা করিলেন তাহা সেই সময় (দ্বাপর যুগে) গ্রাহ্য না হইলেও বিচারের ঐ রায়দান অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ রায়দান না ঐতিহাসিক, না পৌরাণিক, না বৈদান্তিক, না আধুনিক। ঐ রায়দান একাধারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুতান্ত্রিক, অপরদিকে গাণিতিক। রায়দানের এহেন বিশেষণের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমত রায় (Judgement) -টি কি এবং রায়দানের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাত হওয়া অতি আবশ্যিক।

রায়দান প্রসঙ্গে বলদেব উবাচ "সদ্য অনুষ্ঠিত দ্যুতক্রীড়া অবশ্যই কপট ক্রীড়া; যদিও কপটাচার মাত্রই অধর্ম হিসাবে বিচার করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে কপটাচার সামান্য ব্যতিক্রমী। এই ক্রীড়ায় উভয় পক্ষই একই প্রকার কপটতার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। একপক্ষের কপটাচার প্রতিহত হইয়াছে অন্যপক্ষের কপটতার দ্বারা। অতএব কপটতা প্রতিযোগিতায় কোন অন্যায্য লাভ অথবা ক্ষতির সৃষ্টি করে নাই। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার নিরপেক্ষতা নির্ণয়ে কপটতার কোন প্রভাব নাই। অতএব এই প্রতিযোগিতা বৈধ এবং গাণিতিক নিয়মে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্ত নম্বর অষ্টাদশ (১৮) এবং শকুনির ত্রয়োদশ (১৩); অতএব যুধিষ্ঠিরকে জয়ী ঘোষণা করা হইল।"

এই ঘোষণায় সমবেত ভদ্রমন্ডলী (কৌরব পক্ষীয়) নিশ্চুপ হইলেন। পান্ডবপক্ষীয়গণও সাময়িকভাবে হতচকিত। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনি করিবেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হন নাই। কারণ যুধিষ্ঠির বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "আমি এ জয় গ্রহণ করিব না।" এই ক্রীড়াঙ্গনে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন প্রধানা পান্ডবমহিষী দ্রৌপদী। যুধিষ্ঠির পুণরায় মারাত্মক পণ রাখিলে তিনি রাশ টানিতে পারিবেন এই ভরসায়। বলদেবের রায়দান শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীও হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জয়ধ্বনিতে যোগদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে তাঁহার অর্ন্তদহন শুরু হইল। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির অভিমুখে দিকপাত করিয়া উচ্চারণ করিলেন "ভীমরতি"। ভীমের নিকট এই শব্দ সম্পূর্ণ নূতন। আশ্চর্য হইয়া ভাবিলেন ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ভীম নামে সম্বোধণ করিতেছেন। গণিতজ্ঞ নকুল হঠাৎ যৌগিক

গণনা শুরু করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে কৃষ্ণা, অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের বাহাত্তর বৎসর বয়স হয় নাই। তিনি বৃদ্ধ নহেন।" শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন "উনি জ্ঞানবৃদ্ধ"। প্রচন্ড অপমানবোধে বলরাম যুধিষ্ঠিরের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "ভায়া যুধিষ্ঠির তোমার ধর্মজ্ঞান টনটনে হইলেও কান্ডজ্ঞানের বড়ই অভাব।" ভায়া সম্বোধনে যুধিষ্ঠির সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন "অধর্ম is অধর্ম। গণিতের নিয়মে অবশ্য দুটি ঋণাত্মক combine করিলে ধনাত্মক হয়। কিন্তু ধর্মবিচার should not follow গণিতের নিয়ম।" সাধারণ ভারতবাসী ক্রুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করেন। জ্ঞানীরা ইংরাজীভাষা ব্যবহার করেন। যুধিষ্ঠির ক্ষিপ্ত হইলে শুধুমাত্র ক্রিয়াপদে ইংরাজী ব্যবহার করিতেন। বলদেব এই বিজাতীয় ভাষা প্রয়োগে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে একাদিক্রমে (simultaneously) শাপ ও বর দিলেন "তোমার ধর্মজ্ঞানের অহংঙ্কার আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে চূর্ণ হইবে। তুমি সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করিবে এবং একই সাথে কান্ডজ্ঞান লাভ করিবে।" সকলেই অবগত আছেন যুদ্ধক্ষেত্রে "দ্রোণাচার্য বধ"-এর প্রয়োজনে যুধিষ্ঠির সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করেন। যদিও অনেকে "ইতি গজ" শব্দ দুটির উল্লেখ করিয়া উক্ত মিথ্যাভাষণকে ধামাবৃত করিতে সচেষ্ট হন কিন্তু দ্রোণাচার্য যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করে। যেহেতু দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামার নিহত হওয়ার সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করেন অতএব যুধিষ্ঠিরের উক্তির প্রকৃত অর্থ অশ্বত্থামার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি এবং এই উক্তি নিঃসন্দেহে মিথ্যাভাষণ। কিন্তু এই মিথ্যাভাষণের অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্ঠির কান্ডজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই কান্ডজ্ঞানের প্রভাবে তিনি দ্রোণাচার্য বধ না হওয়ার পরিণাম চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধুমাত্র ধর্মজ্ঞানের দ্বারা কোনরূপ ক্রিয়াকর্মের পরিণাম বোধগম্য হয় না। দ্যুতক্রীড়ার সময় (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়) যুধিষ্ঠিরের "ধর্মজ্ঞান টনটনে" (বলরাম উবাচ) ছিল; কিন্তু কান্ডজ্ঞানের উদয় হয় নাই। পরিণামে অশেষ ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দ্রৌপদীকে দ্যুতক্রীড়ায় পণ রাখিবার কালে দ্রৌপদীর স্বামী (অধিকর্তা) হিসাবে তাঁর সচেতনতা "টনটনে" ধর্মজ্ঞানের পরিচায়ক হইলেও ভর্তা (প্রতিপালক) হিসাবে তাহার কান্ডজ্ঞানের কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা হউক কুরুক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য বধের সময়ই তাঁহার কান্ডজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ। যদ্যপি কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মজ্ঞান প্রদান করিবার কালে উপদেশ ছলে আদেশ করেন "কর্মণ্যে অধিকারমস্ত; মা ফলেষু কদাচন"। অর্থাৎ ধর্মানুসারে নিজকর্মে প্রবৃত্ত হও, কর্মের ফল লইয়া বিচলিত হইও না। অর্থাৎ ধর্মানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই সঠিক পথ – পরিণাম যাহাই হউক না কেন কর্মকর্তা কোনভাবেই দায়ী হইবেন না। ধর্মযুদ্ধে যাঁহারা অকারণে অকালে নিহত হন তাঁহাদের মৃত্যু ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন পরস্পরবিরুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় –

(১) যাঁহারা জীবদ্দশায় বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকেন তাঁহারা পাপের বেতন হিসাবে মৃত্যু বরণ করেন।

(২) যাঁহারা জীবদ্দশায় পাপের ঘড়া যথাসম্ভব পূর্ণ করিতে পারেন না তাঁহাদের জন্য পূর্বজন্মের কৃত পাপ দ্বারা মৃত্যুর জন্য প্রয়োজনীয় পাপের কোটা (অর্থাৎ ঘড়া) পূর্ণ করিতে হয়।

(৩) যাঁহারা বিগত জন্মে এবং বর্তমান জন্মে কোনভাবেই তেমনভাবে পাপকর্ম করিতে সমর্থ হয়েন নাই তাঁহাদের অকারণে অকালমৃত্যুর কারণ বিধাতার লিখন – অর্থাৎ নিষ্পাপ জীবের ললাটে বিধাতা অহেতুক আঁকাজোকা করিলে তাহা ললাট মালিকের দোষ হিসাবে গণ্য করা হয়।

অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রে প্রতিটি অকারণ অকালমৃত্যুরই যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে – সে ব্যাখ্যা যতই গোঁজামিল হউক না কেন। একইভাবে প্রতিটি ধর্মাচরণই শাস্ত্রসম্মত – তা সে যতই অনৈতিক হউক না কেন।

জ্ঞানবৃক্ষের মূল (root) হইল ধর্মজ্ঞান। শিকড় পাকাপোক্ত না হইলে গাছ জীবিত থাকে না। সে কারণে ধর্মজ্ঞান মানব মস্তিষ্কে এমনভাবে প্রবেশ (insert) করান হইয়া থাকে যাহাতে উহা জ্ঞানবৃক্ষের মূলে অবস্থান করে। বৃক্ষের উৎপত্তি মূলে, ক্রমে উহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়া কান্ড ও শাখার সৃষ্টি হয়। জ্ঞানবৃক্ষও একই নিয়মে গঠিত হয়। কিন্তু পুরাকালে কাহারও জ্ঞানবৃক্ষের শিকড় প্রস্তুত হইলেই তাঁহাকে জ্ঞানী গণ্য করা হইত। যেহেতু জ্ঞানবৃক্ষ মূল বলিতে ধর্মজ্ঞান বুঝায়, অতএব জ্ঞানী মাত্রেই ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তি। তদ্রুপ গণনায় যুধিষ্ঠির একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন – কিন্তু ভীমকে জ্ঞানী গণ্য করা হইত না। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে অবস্থান করে ধর্মজ্ঞান। ধর্মজ্ঞানের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া জ্ঞানবৃক্ষের বিস্তার হয় উহার কান্ডে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেমন তিনটি ধাপে পূর্ণতা পায় – আলাপ, বিস্তার এবং বর্ণনা; জ্ঞানবৃক্ষও তেমনই পূর্ণতা পায় – মূল, কান্ড এবং শাখা এই তিনটি অংশে। ধর্মজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া কান্ডজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে কান্ডজ্ঞানের সার্থকতা ধর্মজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে। যেমন বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় সার্থকতা প্রায়োগিক বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যায়। ধর্মজ্ঞান কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা নির্মিত, সে সকল শ্লোককে ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশ হিসাবে গ্রাহ্য করা হয়। উক্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাকেই ধর্মাচারণ বলা হয়। যাঁহারা ধর্মাচারণ করেন তাঁহাদের ধার্মিক বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় নির্দেশের অর্থ বোধগম্য না হইলেও উহা পালন করা হইলে তাহাকে আচার (Ritual) বলা হয়। যিনি যত নিপুণতার সহিত আচার পালন করেন তিনি তত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অথবা ধর্মপরায়ণা মহিলা হিসাবে গণ্য হন। অপরপক্ষে যাঁহারা শাস্ত্রীয় শ্লোকের অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ হন তাঁহাদের ধর্মজ্ঞানী নামে অভিহিত করা হয়। পরিতাপের বিষয় শাস্ত্রীয় শ্লোকের ব্যাকরণ সম্মত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ধর্মপরায়ণ "আমজনতা" সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তখনই অপর একপ্রকার ধর্মজ্ঞানী কৌশলে ঐ সকল শাস্ত্রীয় শ্লোকের "জনবান্ধব" (Peoples' Friendly) ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই প্রকার জনবান্ধব ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত ধর্মপরায়ণ এবং ধর্মপরায়ণাগণ তাঁহাদের ধর্মাচরণের সার্থকতা উপলব্ধি করেন এবং বিবিধ প্রকার উৎকট ধর্মাচরণে আপনি উদ্বুদ্ধ হন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ক্রিয়াকলাপকে অনেকে "ধর্মপ্রচার" আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু নিরর্থক (meaningless) ধর্মাচরণ অনেক ক্ষেত্রে অনর্থ সৃষ্টি করে। সেই অনর্থ নিরসনের জন্যই কান্ডজ্ঞান।

ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মাচরণের বলিষ্ঠ পন্থা হিসাবে হোম এবং যজ্ঞ এই দুইটি ক্রিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। এই দুইটি ধর্মাচরণ সাধারণ প্রতিপত্তিশালী (অর্থবান এবং ক্ষমতাবান) ধার্মিকই করিয়া থাকেন। দরিদ্র কৃষক হোমাহুতি দিয়াছেন অথবা শূদ্রাণী দাসী রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন – এবম্প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল। ইহার কারণ হোমের আহুতিতে মনের হিসাবে (১ মন = ৩৭.৫ কি.গ্রাম) ঘৃত ভস্ম হয়। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মাচরণের পন্থা হিসাবে যজ্ঞ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যজ্ঞ দুই প্রকার – হোমযজ্ঞ এবং মেধযজ্ঞ। হোমযজ্ঞের প্রধান উপকরণ "ঘৃত" যাহাকে যজ্ঞাগ্নিতে "ঢালা" ("ঢালা" ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়াপদের ব্যবহার এক্ষেত্রে যথাযথ নহে। "যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রদান" বাক্যটি যথেষ্ট বলিষ্ঠ নহে।) হয়। মেধযজ্ঞের প্রধান উপকরণ একটি সুস্থ সবল সুঠাম পশু (সাধারণত অশ্ব) যাহাকে নিধন করা হয়। এক্ষণে উল্লেখ প্রয়োজন, সুস্বাদু এবং সর্বোৎকৃষ্ট রন্ধন উপকরণ যে "ঘৃত" তাহা ভক্ষণ না করিয়া ভস্মণ করা এবং তৃণভোজী পরোপকারী চতুষ্পদ তাহাকে সম্পদ না ভাবিয়া নিধন করা কোনটিই সদর্থক নহে বরঞ্চ অনর্থক। দীর্ঘকাল যাবৎ এবম্প্রকার অনর্থক ক্রিয়াকর্ম ধর্মাচরণ নামে আমাদিগের বিশ্বাসের মূলে গ্রোথিত হইয়া আছে। কিন্তু এই অনর্থক ক্রিয়াদি ক্রমশ অনর্থের সৃষ্টি করে। কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা (যাহার

অধিকাংশই অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত) জনিত সমস্যার কারণে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী ঘৃতের ভস্মনকে খাদ্যের অপচয় এবং অহিংস পশুর নিধনকে নিষ্ঠুরতা হিসাবে গণ্য করা হইল। ফলতঃ কট্টর ধার্মিক (Fundamentalist) এবং মৃদু ধার্মিক (Reformist) এই দুই অংশে জ্ঞানীরা বিভক্ত হইয়া পড়েন। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে নরমপন্থীদের এই আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলন বা Reformation বলা হয়। ধর্মসংস্কারের ভিত্তি যে জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই "কান্ডজ্ঞান" বলা হয়। পৌরাণিক যুগে কতিপয় কান্ডজ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও তাঁহারা সমাজে স্বীকৃতি পান নাই, উপরন্তু তাঁহাদিগকে সামাজিক বর্জন বা একঘরে করা হইয়াছিল। মহর্ষি চার্বাক এবং মুনিশ্রেষ্ঠ জাবানি এমনই কয়েকজন কান্ডজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। চার্বাক মহাঋষি ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান বা তথাকথিত ধর্মজ্ঞানে তিনি সমকালীন সকল মহাজ্ঞানীদের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানকে কেহই অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তিনি শাস্ত্রের নির্দেশকে অনুসিদ্ধান্ত (Axiom) হিসাবে গণ্য করিতে পারেন নাই। তিনি প্রতিটি নির্দেশের যথার্থতা বিচার করিতেন এবং প্রয়োজনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মেও পিছপা হইতেন না। তাঁহার রচিত সামাজিক সূত্রাবলী প্রথম কান্ডশাস্ত্র (কান্ডজ্ঞান ভিত্তিক শাস্ত্র) হিসাবে অপখ্যাত হইয়াছিল। এই জ্ঞানের অপর নাম "চার্বাক দর্শন"।

পরবর্তীকালে 'কপিলাবস্তুর' যুবরাজ শাক্যসিংহ জ্ঞানবৃক্ষের মূলের উপর কান্ডের বিস্তারে অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানের সফল প্রয়োগে কি উপায়ে জীবজগতের হিত সাধন করা যায়, তাহার উপর নিরন্তর সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। এই সাধনার জন্য যথেষ্ট মনোঃসংযোগ প্রয়োজন। রাজপ্রাসাদে তাহা সম্ভব নহে। তৎকারণে তিনি গৃহত্যাগ করেন। রাজকুমার শাক্যসিংহ কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। আধুনিক যুগে (কলিযুগে) সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে সন্ন্যাস পূর্ববর্তী দুইটি আশ্রম (ব্রহ্মচর্য এবং গার্হস্থ্য) অতিক্রম করিয়া (Through proper channel) আসিতে হইত। শাক্যসিংহ কিছুই করেন নাই।

কল্পনা-সূত্রে অবগত আছি গৃহত্যাগের পূর্বে যুবরাজ গৌতম যথেষ্ট ধর্মজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু অবান্তর ধর্মজ্ঞান তাঁহার উৎসুক্য নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। সে কারণে কতকটা কৌতুহলবশে তিনি চার্বাক দর্শন (অর্থাৎ কান্ডশাস্ত্র) পাঠ করেন। পাঠান্তে তিনি উপলব্ধি করেন যে মহর্ষি চার্বাক কেবলমাত্র অসাড় শাস্ত্রবচনগুলি যথাচারে পালনের বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানীর সঠিক আচরণবিধি সম্বন্ধে সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ণয় করিতে হইলে কান্ডজ্ঞানের উপর গভীর গবেষণার প্রয়োজন। পিতা শুদ্ধধনকে তিনি মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। মহারাজ শুদ্ধধন (তিনিও মহাজ্ঞানী) পুত্রের সাধন অভিলাষের গুরুত্ব অনুধাবণ করিয়া গৃহত্যাগে সম্মতি দেন। পুত্রের গবেষণায় সিদ্ধিলাভের বিষয় তিনি এতটাই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রের নামকরণ করেন "সিদ্ধার্থ"। যাহাই হউক পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থ কান্ডজ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং কান্ডজ্ঞানভিত্তিক ধর্মসংস্কার করেন। কিন্তু এই সংস্কার চার্বাক দর্শনভিত্তিক, সম্পূর্ণ কান্ডভিত্তিক নহে। কারণ সংস্কৃত (Reformed) আচরণাবলী ঘৃত ভস্মন এবং পশু বধ বিরোধী হইলেও উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে অস্বাভাবিকতা আরোপ করা হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ধর্মে (বৌদ্ধধর্ম) জন্মান্তরবাদ, নির্বাণ ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে চার্বাক দর্শন বিরুদ্ধ। অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ কর্তৃক ধর্মাচরণবিধি কিয়ৎ পরিমাণে কান্ডজ্ঞানভিত্তিক, সম্পূর্ণরূপে নহে। অবশ্য পরবর্তীকালে গৌতমবুদ্ধের দুই অনুগামী "চরক" এবং "শুশ্রুত" উভয়েই কান্ডজ্ঞানভিত্তিক যে সকল পুঁথি প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেগুলি অদ্যপি সমগ্র বিশ্বে চিকিৎসা শাস্ত্রের আকর গ্রন্থ হিসাবে মান্য।

অমিতাভ পালের ন্যায় জীব – যিনি একই সাথে নিউটনের ধর্মে এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জিরাফে অবস্থা করেন – ধর্মজ্ঞানী এবং কান্ডজ্ঞানীকে একই সাথে দার্শনিক রূপে গণ্য করিতে ভালোবাসেন। তাঁহার মতে ধর্মজ্ঞান হইল আধ্যাত্ম দর্শন (Spiritual Philosophy) এবং কান্ডজ্ঞান বাস্তব দর্শন (Materialistic Philosophy)। সেই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, হজরৎ মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি সকলেই আধ্যাত্ম দার্শনিক। অপরপক্ষে চার্বাক, কৌটীল্য চাণক্য, গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, আর্কিমিদিস, নিউটন, কার্ল মার্কস, আব্রাহাম লিঙ্কন ইত্যাদি সকলেই বাস্তু দার্শনিক। কিন্তু স্থূল মস্তিস্কে শ্রীযুক্ত পাল ইহা স্থির করিতে পারিতেছেন না যে সক্রেতিস, অ্যারিষ্টটল, প্লেটো, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রোমারোঁলা ইত্যাদি মহান জ্ঞানীরা কি ধরণের দার্শনিক। ইঁহারা আধ্যাত্ম দর্শনকে অশ্রদ্ধা করেন না আবার বস্তুবাদী দর্শনকে অস্বীকার করেন না। ইঁহারা কোন ধরণের দার্শনিক? আদৌ এনারা দার্শনিক বটেন ত? এই জটিলতার সমাধানের প্রয়াস লইয়াছিলেন বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্য, যিনি অরূপ দর্শন (Abstract Philosophy) দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন "ব্রক্ষ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা", এবং অনিশ্চিতবাদী হাইজেনবার্গ। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের "সকলই মায়া" এবং হাইজেনবার্গের "সকলই অনিশ্চিত" এই দুই সূত্রের কোন প্রভেদ নাই। সাধক কমলাকান্ত শ্যামা মায়ের রূপ নিরূপণ করিতে না পারিয়া সহসা পাগল হইয়াছিলেন। এই কলমের লেখকও তেমনই প্রকৃত দর্শনের স্বরূপ হিসাবে মহর্ষি মুজতবা আলী বিরচিত নিম্নলিখিত বাংলা (এক্ষেত্রে "বাংলা" শব্দের অর্থ "সরল") মন্ত্রটি দীর্ঘদিন জপ করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রটি হইল "প্রকৃত দর্শন চর্চা হইল অমানিশার অসিত অন্ধকারে অনুপস্থিত অশ্বডিম্বের অকারণ অনুসন্ধান।"

কান্ডজ্ঞানের উৎস সকল

(১) শ্রীকৃষ্ণের অবতারবাদ (পরিত্রাণায় সাধুনাং .....)

(২) আর্যসমাজের একেশ্বরবাদ

(৩) ব্রাক্ষ্ম সমাজের নিরাকারবাদ

(৪) শংকরাচার্যের মায়াবাদ (ব্রক্ষ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ....)

(৫) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ ($\Delta p. \Delta q \geq \hbar$)

(৬) চাণক্যের রাজনৈতিক বস্তুবাদ

(৭) কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

(৮) আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রবাদ

(৯) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবাদ এবং

(১০) স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ।

DEPARTMENT OF PHYSICS
2ND REUNION
2018
Reunion '18

Picnic '19

বিভাগের শিক্ষাকর্মী প্রদীপ চক্রবর্তীর বাড়ি 'মায়ের আশীর্বাদ', বারাসাতে
চিত্রগ্রহণ ও উপস্থাপনা – সৌভিক সরকার, দ্বিতীয় বর্ষ

Department of Physics

Teaching Staff

Dr. (Smt.) Mitali Middya (HOD)	Associate Professor
Dr. (Smt.) Mita Mondal	Associate Professor
Dr. (Smt.) Samapti Pal	Associate Professor
Dr. Kausik Mukhopadhyay	Assistant Professor
Dr. Somdeb Chakraborty	Assistant Professor
Dr. Anshuman Nandy	Assistant Professor
Sri Kalyan Samajpati	Graduate Laboratory Instructor
Smt. Debasmita Samanta	Guest Lecturer
Sri Tapan Kumar Sashmal	Guest Lecturer
Smt. Devdali Banerjee	Guest Lecturer

Non-teaching Staff

Sri Taraknath Das (Retired on January 2019)	Laboratory Attendant
Sri Pradip Chakraborty	Laboratory Attendant
Sri Uchit Das	Laboratory Attendant

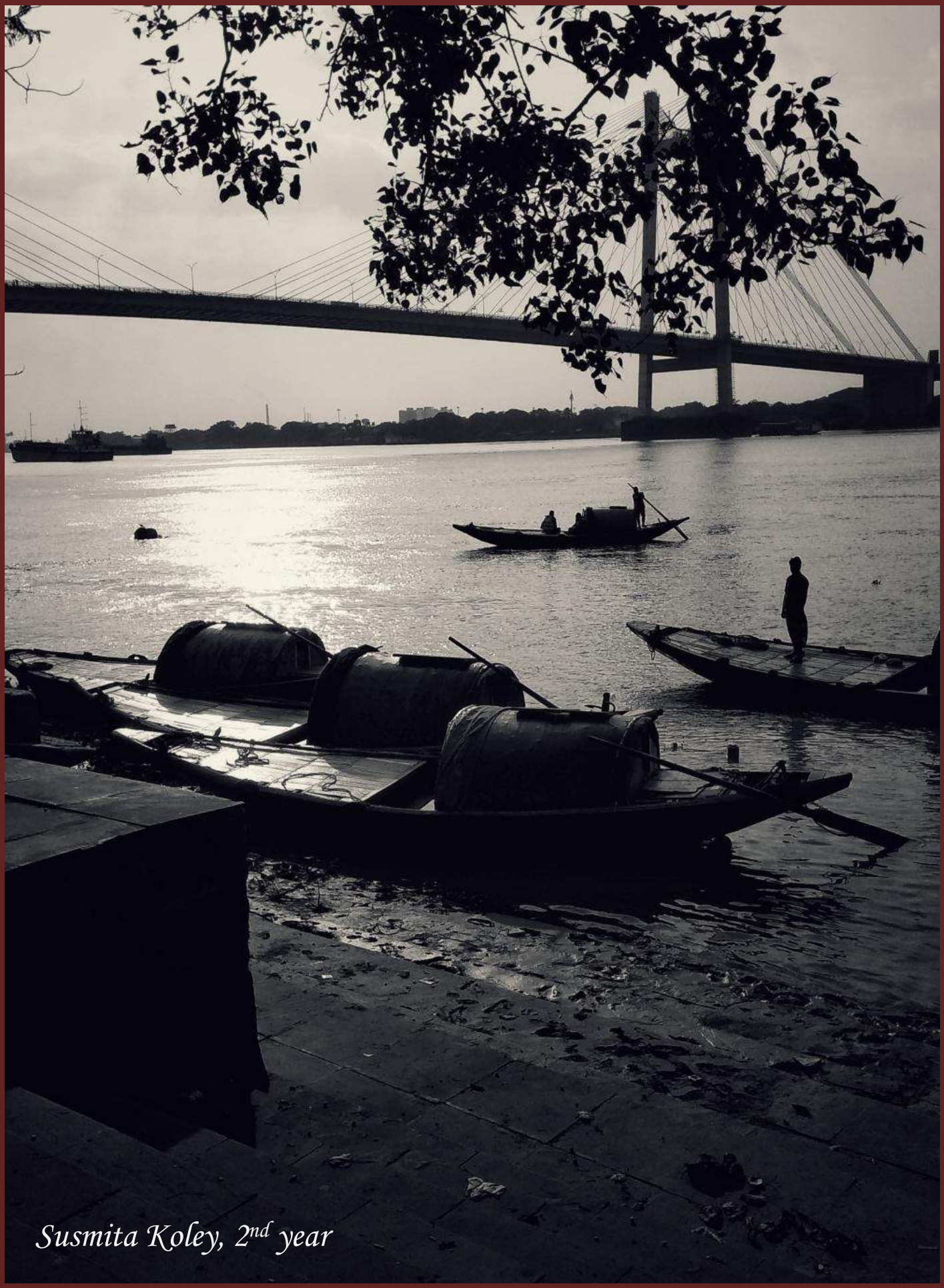

Susmita Koley, 2nd year